প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৫১ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ড
।। জিজ্ঞাসা ।।
১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ২৯
প্রকাশন বিভাগ। ১এ কলেজ রো। কলিকাতা ৯

মুদ্রাকর শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১ কলেজ স্ট্রীট। কলিকাতা ১২

সূচী

গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বহুদিন পূর্বে লিখিত এবং অতিশয় জীর্ণ, এজন্য রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক পুনর্লিখিত সকল অংশের প্রতিচিত্র দেওয়া সম্ভব হয় নাই। অনেক অংশ পুনরায় লিখিয়া দেওয়া ব্যতীত, রবীন্দ্রনাথ অনেক অংশে শব্দের পরিবর্তন এবং ভাষার সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন—নমুনাস্বরূপ সেরূপ একটি অংশের প্রতিচিত্র গ্রন্থশেষে মুদ্রিত হইল। ইহা হইতে পাঠক অনুমান করিতে পারিবেন রবীন্দ্রনাথ কতখানি ধৈর্য ও আগ্রহের সঙ্গে এই পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পরিমার্জন করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ যে-সমস্ত অংশ পুনরায় লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা গ্রন্থ-মধ্যে ↦ ↤ এই চিহ্নের অন্তর্গত আছে।

পরিচায়িকা

শান্তিনিকেতনের প্রাক্‌কুটীরের উত্তরে গাবতলার ইঁদারার কাছে ছোট একটা খড়ের ঘর—তিনটা খুপরি। পশ্চিমদিকটায় থাকেন হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—দেখতাম স্তূপীকৃত কাগজ-পত্রের মধ্যে বসে কাজ করছেন, নিয়মিত সময়ে পড়াচ্ছেন, সন্ধ্যার পর একটা ভাঙা সেতার নিয়ে একটা গৎ বাজাচ্ছেন। পাশের ঘরে থাকেন রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—যিনি সতীশচন্দ্রের মৃত্যুকালে আশ্রমে একা ছিলেন—তাঁর শেষকার্য করা পর্যন্ত। আর ছিলেন হরেন্দ্রনারায়ণ কবিরঞ্জন। দেখেছি প্রতিদিন প্রাতে স্নান আহ্নিক সেরে আপিসে গিয়ে বসতেন। ঋজু দেহ, গায়ে চাদর, লম্বা কোঁচা, পায়ে খড়ম—নিষ্ঠার প্রতীক।

আমি আশ্রমে আসবার বৎসর দুই পূর্বে তিনি এসেছিলেন। এখানে আসার পূর্বে তিনি নদীয়া জেলার মাণিক্যহার গ্রামের এক ছোট জমিদার-বাড়ীতে ছেলেমেয়েদের গৃহশিক্ষক ছিলেন। বাংলা ভাষা ভাল করে জানা ছিল বলেই এই কাজটা পেয়ে থাকবেন। নিকটেই শিলাইদহ। সেখানে ঠাকুর এস্টেটে তিনি কাজ নিলেন। কবির সঙ্গে পরিচয় হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারী সেরেস্তা থেকে জগদানন্দ রায় ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলে আনেন তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে। হরেন্দ্রনারায়ণের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা দেখে তাঁকেও আশ্রমে আনলেন। পরিচয়টা হয় কবির উপন্যাস ‘নৌকাডুবি’ নিয়ে। কবিরঞ্জন

'নৌকাডুবি'র এক উপসংহার লিখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ সেটি দেখে আদ্যন্ত সংশোধন করে দিয়েছিলেন। এত বৎসর পরে সেই খসড়ার উদ্ধার হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

আমরা জানতাম 'কবিরঞ্জন' উপসংহার লিখেছেন; সকলেই একটু বক্রোক্তি করে বলতেন, দামোদর মুখুজ্জে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের উপসংহার লিখেছিলেন—তার যা সাহিত্যিক মূল্য, এ রচনারও মূল্য তার থেকে বেশী হবে না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং সেই উপসংহারটা কেটে-ছেঁটে নতুন করে লিখে দিয়েছিলেন।

হরেন্দ্রনারায়ণের বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দির সন্নিকট মহীসার গ্রামে। এঁর পিতা বিষ্ণুচন্দ্র ছিলেন সেকালের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ আইনজীবী। হরেন্দ্রনারায়ণ বাংলা ও সংস্কৃত শেখেন; ইংরেজি বা আধুনিকতার চর্চার বিশেষ সুযোগ পান নি। কুলরীতি অনুসারে বিবাহ হয়—কিন্তু বেশীকাল সংসার করতে পারেন নি; স্ত্রী হেমবরণী মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে, একটি পুত্র রেখে মারা যান (১৯০৭ মার্চ)। 'মুমূর্ষু পৃথিবী'র খ্যাতনামা লেখক হীরেন্দ্র-নারায়ণ সেই পুত্র। মাতৃবিয়োগ-কালে হীরেন্দ্রর বয়স ছিল মাত্র দেড় বৎসর। হরেন্দ্রনারায়ণ আর দারপরিগ্রহ করেন নি। ১৯১৩ সালে বালক হীরেন্দ্রকে তিনি নিজের কাছে আশ্রমে আনলেন—পিতাপুত্রে থাকতেন সেই খড়ের ঘরে।

বিশ্বভারতী স্থাপনার প্রাক্কালে হরেন্দ্রনারায়ণ আশ্রম ত্যাগ করে যান। তাঁর মাতা অতিবৃদ্ধা হয়েছেন, তাঁর সেবা করার কেউ নেই, কাজেই তাঁকে যেতে হল। হরেন্দ্রনারায়ণের মাতৃভক্তি, সত্যনিষ্ঠা ও সরলতা ছিল চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। সেই সঙ্গে ছিল তাঁর অসামান্য তেজস্বিতা। এই সব উল্লেখযোগ্য সদ্‌গুণের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্নেহের পাত্র ও বিশ্বাসভাজন ছিলেন।

পূর্বে বলেছি, লেখাপড়ার চর্চা তাঁর অভ্যাসগত হয়েছিল। তখনকার দিনের সাপ্তাহিক হিতবাদী, বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় 'বৃদ্ধের বচন' ও 'বৃদ্ধের টিপ্পনী' নামে কবিরঞ্জন-লিখিত নানা বিষয়ের সমালোচনা ও রচনা প্রকাশিত হত। 'কান্দি-বান্ধব' ও 'মুর্শিদাবাদ-হিতৈষী' প্রভৃতি পত্রিকাতেও তিনি লিখতেন। মোটকথা, 'শ্রীবৃদ্ধ' স্বাক্ষরে তাঁর অনেক লেখা ছড়িয়ে আছে। সামাজিক, রাজনৈতিক নির্ভীক সমালোচনা এগুলি। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে তিনি মনের যে সাহস নিয়ে তাতে নেমেছিলেন, সেটি কালান্তরে ম্লান হয় নি। তবে এ কথা ভুললেও চলবে না, তাঁর ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে বিশ্বাস প্রাচীন ব্রাহ্মণপন্থীই ছিল।

হরেন্দ্রনারায়ণের বাহিরের জীবন যেমন সরল সহজ ছিল, মনটাও ছিল তদ্রূপ। এই সরলতার জন্য তাঁকে একবার কি দুঃখ পেতে হয় তার কাহিনীটা বলি।

কলকাতা থেকে আসছেন—সকালে গাড়ি ছাড়ে হাওড়া স্টেশন থেকে। টিকিট ঘরে গিয়ে দুটো টাকা দিয়ে বোলপুরের টিকিট চাইলেন। ভিতরের কাউণ্টারে ফিরিঙ্গি মেয়ে—বললে, 'নো চেন্‌জ্‌'। ভাড়া তখন এক টাকা পাঁচ আনা। হরেন্দ্রনারায়ণের ইংরেজি বিদ্যা সামান্য—অনেক ভেবে বললেন, 'মাস্‌ট্‌'। মাস্‌ট্‌ শুনেই মেয়েটা টিকিটের ঝাঁপ দিল বন্ধ করে। হতভম্ব হয়ে হরেন্দ্রনারায়ণ ফিরে গিয়ে একটি বেঞ্চে বসে আছেন—ট্রেন গেল চলে। পাশে এসে একটি লোক বসলেন। পরিচয় হল। তিনিও লুপ লাইনে যাবেন। হরেন্দ্র শুনে ভারি খুসি। লোকটিকে তাঁর টিকিট করার অভিজ্ঞতা বলাতে তিনি আশ্বাস দিলেন—টিকিট তিনিই করে আনছেন। টাকা দুটো নিয়ে চলে যাবার সময় বলে গেলেন, 'আমার এই ছাতাটা থাকল—এখনি আসছি!' বাস্‌! টিকিটও এল না, ছাতাও নিতে কোন লোক

এল না   হরেন্দ্র বসেই আছেন। এমন সময় শান্তিনিকেতনের কে যেন হাওড়া স্টেশনে এসেছেন দ্বিতীয় গাড়ী ধরবার জন্য। হরেন্দ্রনারায়ণকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন— 'ব্যাপার কি'। তিনি সব কথা বিবৃত করে বললেন, 'ভদ্রলোক ছাতা রেখে গেছেন, নিশ্চয়ই আসবেন।' বন্ধুটি বললেন, 'ছাতার দাম ছয় পয়সাও হবে না। আপনি উঠুন।' কিন্তু হরেন্দ্রনারায়ণ বলছেন, 'ভদ্রলোকের ছাতা!' অবশেষে আশ্রমের লোকটির ব্যবস্থায় তিনি বোলপুর ফিরে এলেন। কিন্তু থেকে থেকেই পথে বলেছেন, 'ছাতাটার কি হবে?'

আর একটা ঘটনা মনে পড়ছে।

১৯১০ সালের বোলপুর ও ১৯৩৩ সালের বোলপুর যেন কেউ তুলনা না করেন। হরেন্দ্রনারায়ণ সন্ধ্যার মুখে একদিন কি কাজে বোলপুর গিয়েছেন। সেখানে একটি ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। ভদ্রলোকটি গ্রামে থাকেন—কখনো সন্ধ্যায় শহরে আসেন নি—'কোথায় থাকবেন ভেবে পাচ্ছেন না। হরেন্দ্রনারায়ণ আশ্বাস দিয়ে বসলেন, বললেন, 'আশ্রমে চলুন, আমি খাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব।'

শান্তিনিকেতনে এসে ভদ্রলোক তো হরেন্দ্রনারায়ণের কুটীরে উঠলেন; সে রকম ঘর দোর দেখতেই তিনি অভ্যস্ত। কিছুক্ষণ পরে ছাত্রাবাস ও রান্নাঘর দেখাবার জন্য তাঁকে নিয়ে চললেন। সেদিন বুধবার। সন্ধ্যায় ছেলেরা গিয়েছে মন্দিরে। সমস্ত ঘর হাঁ হাঁ করছে, জনপ্রাণী নেই, কেবল ডিট্‌মারের আলো ঝুলছে ঘরে। আর ঘরে ঘরে বিছানা পাতা। রান্নাঘরে গিয়ে দেখেন, শ' দুই পিঁড়ি পাতা, সামনে শালপাতা সাজানো—অথচ খাচ্ছে না কেউ! এসব দেখে ভদ্রলোকটি কি রকম হয়ে গেলেন! হরেন্দ্রনারায়ণ নিজে রান্না করে খাওয়াবেন বললেন, কত সাধলেন —তিনি কিছুতেই খাবেন না—একেবারে আড়ষ্ট হয়ে থাকলেন।

ভোর না হতেই লোকটি আশ্রম ছেড়ে কখন চলে গেছেন তা কেউ জানতে পারে নি! হরেন্দ্রনারায়ণের এ অভিজ্ঞতা আমরা জানি। আসল কথা—মানুষটির মন ছিল স্বচ্ছ। তাই সকলকে বিশ্বাস করতেন এবং আপনার প্রীতি প্রসারিত করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠতেন।

বহু বৎসর এক সঙ্গে আশ্রমে ছিলাম; তাই মানুষটিকে জানবার অবসর হয়েছিল। তখন শান্তিনিকেতন ছিল ছোট একটি পরিবারের মত। তাই পরিচয়টা কেবল বাইরের আবরণীর মধ্যে সীমিত থাকত না—মানুষের ভিতরটার পরিচয়ও পাওয়া যেত। যেসব সাধারণ মানুষ—যাদের ভোলা যায় না—এবং যাঁরা মনের উপর কিছু রেখা টেনে গেছেন, তাঁদের অন্যতম এই বিস্মৃত মানুষটি।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ভূমিকা

'নৌকাডুবির পরে'র লেখক কবিরঞ্জন হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সুলেখক শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় আমার বাল্যবন্ধু। দুজনে একসময় শান্তিনিকেতনে ছিলাম, সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। হীরেন্দ্র আমার চেয়ে কয়েক বছরের ছোট। বছর চারেক আগে একদিন তাঁর পিতার প্রসঙ্গে তিনি বললেন যে, তাঁর পিতা 'নৌকাডুবি'র এক উপসংহার লিখেছিলেন, আর সে উপসংহার রবীন্দ্রনাথ দেখে সংশোধন ক'রে দিয়েছিলেন। পূর্বেও আমি এ কথা অনেকের কাছে শুনেছিলাম। খুব কৌতূহল হল। আমার অনুরোধে হীরেন্দ্র পুরানো খাতাখানা বের ক'রে দেখালেন। দেখবামাত্র আমার সমস্ত সংশয় দূর হল। মার্জিনে রবীন্দ্রনাথের সুপরিচিত হস্তাক্ষরে সংশোধন, আর ভাষায় রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভঙ্গী। নিতান্ত অন্ধ না হলে সে হস্তাক্ষর, আর নিতান্ত বধির না হলে সে ভাষা সকলেই চিনতে পারবে। মূল রচনায় অনেক পরিবর্তন ও পরিবর্জনের চিহ্ন বর্তমান, বেশ বুঝতে পারা যায় রবীন্দ্রনাথ যত্নসহকারে কাজটি করেছেন, আর সময়ও কম লাগে নি। পঞ্চাশ বছরে খাতাখানি নষ্ট হতে পারত, তা যে হয় নি সে বাঙালী পাঠকের সৌভাগ্য, আর সে জন্য হীরেন্দ্রনারায়ণ সকলের কৃতজ্ঞতার পাত্র। আমি তখনই বললাম—এখনই ছাপাও, এ মস্ত একটা আবিষ্কার। হীরেন্দ্র বললেন, কে ছাপবে? আমি বললাম, যে এর তাৎপর্য

বুঝবে সে-ই ছাপতে রাজি হবে।

'জিজ্ঞাসা' সাগ্রহে সেই গ্রন্থ ছাপতে উদ্যোগী হয়েছেন। এতদিন পরে সেই গ্রন্থ প্রকাশিত হচ্ছে। তার জন্য প্রকাশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ডকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিত পরিচায়িকাতে হরেন্দ্র কবিরঞ্জনের বিষয় কতক কথা জানতে পারা যাবে—তার মধ্যে দুটি বিষয় আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। প্রথম, শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকগণ তখনই জানতেন যে হরেন্দ্রনারায়ণ 'নৌকাডুবি'র উপসংহার লিখেছেন; দ্বিতীয়, বিশ্বভারতী স্থাপনার প্রাক্কালে তিনি শান্তিনিকেতন পরিত্যাগ করেন। শান্তিনিকেতনে তিনি করে আসেন তার উল্লেখ নেই। প্রভাতকুমার লিখেছেন, তিনি আশ্রমে আসবার বৎসর দুই পূর্বে হরেন্দ্রনারায়ণ এসেছিলেন। আমার বেশ মনে আছে ১৯১৪-১৫ সালে তাঁকে দেখেছি, কাজেই হরেন্দ্রনারায়ণ এসেছেন তার আগে। এই গবেষণার বিশেষ প্রয়োজন আছে, কেননা তার উপর 'নৌকাডুবির পরে' লিখবার সময় নির্ভর করতে পারে। অবশ্যই ১৯০৬ সালের পরে, কেননা ঐ সালে 'নৌকাডুবি' প্রকাশিত হয়। কাজেই ১৯০৬ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে লিখিত হওয়াই সম্ভব। কারণ, শান্তিনিকেতনে থাকা কালেই সকলে জানতেন যে কবিরঞ্জন উপসংহার লিখেছেন।

মূল পাণ্ডুলিপির একস্থানে ১২ আগস্ট ১৯১১ তারিখটি লিখিত আছে। যদি ঐ লেখা তৎকালসূচক হয় তবে ওটাকে রচনার কিম্বা সংশোধনের তারিখ বলে গ্রহণ করতে বাধা দেখি না। আমার অনুমান ঐ বছরে লেখা ও সংশোধন দু'ই ঘটেছিল। আমার অনুমান যদি সত্য হয় তবে দাঁড়ায় এই যে, 'নৌকাডুবি' প্রকাশের পাঁচ বছর পরে রবীন্দ্রনাথের পরিচিত একব্যক্তি ঐ গ্রন্থের উপসংহার লেখেন আর রবীন্দ্রনাথ ধীরভাবে পাঠ ক'রে তা সংশোধন ও পরিমার্জন ক'রে দেন।

২

কবিকর্তৃক সংশোধিত 'নৌকাডুবির পরে'কে মস্ত একটা আবিষ্কার বলেছি। কেন বলেছি এবারে খুলে বলি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে অনেক কথাই পাঠকে জানে— তাঁর কবিস্বভাব, ব্যক্তিস্বভাব, সাহিত্যধর্ম প্রভৃতি সুবিদিত। অনেক খ্যাত ও অখ্যাত লেখকের রচনায় তিনি হস্তক্ষেপ ক'রে সংশোধন ক'রে দিয়ে তার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছেন—এ কথাও অনেকের সুবিদিত। কিন্তু সাহিত্য-সংসারে অপরিজ্ঞাত একজন লেখক তাঁর রচনার উপরে হস্তক্ষেপ করেছেন, আর তিনি তা সহ্য করেছেন—না, শুধু সহ্য করা নয়, ধীরভাবে তা সংশোধন ক'রে দিয়েছেন—এমন ঘটনার জন্য বোধ-করি কেউ প্রস্তুত ছিলেন না। কপালকুণ্ডলার উপসংহার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য ও মত কি ছিল জানি নে, তবে এ কথা নিশ্চয় যে তিনি তা সংশোধন ক'রে দেন নি। রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন।

এই সংশোধন-ব্যাপারকে একপ্রকার অনুমোদন ও সহযোগিতা বললে অন্যায় হবে না। আর এতে রবীন্দ্রচরিত্রের আর একটি নূতন দিকের পরিচয় পাওয়া গেল। রবীন্দ্রচরিত্রে একটি স্পর্শ-কাতরতা ও অসহিষ্ণুতা ছিল বলে অনেকের ধারণা। 'নৌকাডুবির পরে'র সংশোধনে সেই ধারণা খণ্ডিত হচ্ছে। ইংরাজি 'গীতাঞ্জলি'র উপরে ইয়েট্‌সের হস্তক্ষেপ আছে বলে অনেকের ধারণা, এই ধারণা যে নিতান্ত ভুল রটেনস্টাইনের Men and Memories গ্রন্থ থেকে তা জানতে পারা যাবে। কিছু পরবর্তীকালে কবি রবার্ট ব্রিজেস রবীন্দ্রনাথের ইংরাজি রচনার একটি শব্দ পরিবর্তনের অনুমতি চেয়ে

পান নি। কাজেই তাঁর স্পর্শকাতরতার ধারণা নিতান্ত অমূলক নয়। সেই কবিকে যখন দেখি নিজের গল্পের উপসংহার সংশোধন ক'রে দিচ্ছেন, অর্থাৎ প্রকারান্তরে সহযোগিতা করছেন, তখন পূর্বোক্ত ধারণা খণ্ডিত না হয়ে যায় না। বস্তুতঃ তাঁর কবিস্বভাব যুগপৎ পরম সহিষ্ণু ও অসহিষ্ণু ছিল, এখানে পরম সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত। এ তো গেল কবিস্বভাবের বিবরণ এখন সংক্ষেপে কাব্যের অর্থাৎ 'নৌকাডুবি'র কথা সেরে নেওয়া যেতে পারে।

৩

'নৌকাডুবি'তে নলিনাক্ষের সঙ্গে কমলার মিলন ঘটেছে। সমস্ত দুঃখের পসরা মাথায় নিয়ে বিদায় নিয়েছে রমেশ, তার পিছনে আছে ছায়াময়ী, বিষাদপ্রতিমা হেমনলিনী। 'নৌকাডুবির পরে' গ্রন্থে দেখানো হয়েছে, রমেশের পরিণীতা পত্নী সুশীলা জলমগ্ন হয়েও মারা যায় নি, ঘটনার দীর্ঘ বাহু তাকে নিয়ে গিয়েছে সুদূর বৃন্দাবনে। শেষপর্যন্ত সেখানে তার সঙ্গে মিলন ঘটেছে রমেশের। এবারে অবিভক্ত দুঃখের পসরা তুলে নিতে হয়েছে একাকিনী হেমনলিনীকে। সংসারে সুখের চেয়ে দুঃখ যদি অধিক হয় তবে এমন অপরিহার্য। জোড়ায় জোড়ায় মিলে গিয়ে বেজোড় যে অবশিষ্ট থাকল তার ভাগ্যে দুঃখ ছাড়া আর কি মিলবে। তবে ইতিমধ্যে হেমনলিনী সেই শক্তি অর্জন করেছে যার ফলে দুঃখ তার পক্ষে দুর্বহ হয়ে ওঠে নি। 'নৌকাডুবি' উপন্যাসকে যাঁরা গভীর ভাবে আলোচনা করতে চান তাঁদের উচিত হবে কবিকর্তৃক সংশোধিত উপসংহারকে মূল গ্রন্থের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা। এই উপসংহারের মধ্যে কবির ধারণার উপসংহার আছে মনে করলে অন্যায় হবে না। সাধারণ কৌতূহলী পাঠক ও বিশেষজ্ঞ পাঠক

দুয়ের পক্ষেই 'নৌকাডুবির পরে' অপরিহার্য পাঠ্য, কারণ এই বইখানি প্রকাশে একই সঙ্গে রবীন্দ্রসাহিত্য তথা রবীন্দ্রসাহিত্য-সমালোচনার একটি অপ্রত্যাশিত দিক উদ্‌ঘাটিত হল।

প্রমথনাথ বিশী

১

যদি আশালতা মানবের হৃদয়-তরুকে তাহার সুকোমল অঙ্গের দ্বারা বেষ্টন করিয়া না রাখে তাহা হইলে অনেক স্থলেই তাহার জীবন-ধারণ দুঃসহ হইয়া উঠে। আশা! তোমাকে ধন্যবাদ! তুমিই হতাশ মানুষের সংসার-মরুভূমির মায়াবিনী মরীচিকা!

যে লতা-বধূ সুদৃঢ় বন্ধনে জড়িত হইবার আশায় বাহু প্রসারিত করিয়াই তাহার আশ্রয়তরুর পাদমূল হইতে ঘূর্ণী বায়ুর দুর্বিপাকে বিচ্ছিন্নাবস্থায় ধূলিধূসরিতা হইয়াছিল, যে বালিকা একদিন তাহার জীবনের মূল্য না জানিয়া দুঃখের হাত হইতে ত্রাণ পাইবার নিমিত্ত জীবনকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়াছিল, আশা! তুমিই তাহাকে সেই ঘোর দুর্দিনে তোমার সুস্নিগ্ধ ছায়ায় আশ্রয় দিয়াছিলে, তোমারই প্রসাদে আজ সেই নিরাশ্রয়া বালিকা তাহার চির-প্রার্থিতের চরণপ্রান্তে পৌঁছিতে পারিয়াছে। এখন তাহার জীবন-উদ্যানের সৌভাগ্য-প্রসূন, সরস সৌরভে দিগন্ত পরিব্যাপ্ত করিয়া প্রস্ফুটিত হইয়াছে, আজ তাহার আনন্দের পরিসীমা নাই।

↦সাবিত্রী যেমন আপনার হৃদয়ের তপস্যা দ্বারা পতিকে উদ্ধার করিয়াছিল, বেহুলা যেমন স্বীয় অপরিসীম ধৈর্য এবং ত্যাগের দ্বারা পতিমুখ সন্দর্শন করিয়াছিল এবং মহাদেব যেমন তপস্যা করিয়া আপনার জটাজাল হইতে ভগবতীকে আহ্বান করিয়া আনিয়াছিলেন, কমলাও তদ্রূপ হৃদয়ের অত্যাশ্চর্য নিষ্ঠা এবং পতিভক্তি দ্বারা আজ স্বামীকে লাভ

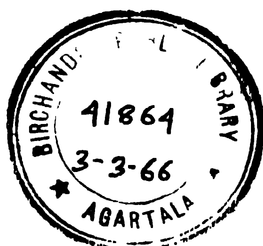
করিল। এই মিলন বহু দুঃখের পর বলিয়া রমণীর শ্রদ্ধাকৃষ্ট বিধিদত্ত দান-স্বরূপই কমলা তাহা গ্রহণ করিল। সে নিজেই জানিত না যে, সতীর তপস্যা ভগ্ন হইবার নহে।↤

↦তাই↤ কমলার সুখ আজ কবি-কল্পনার অতীত। যাহাকে সর্বদা নয়নের পুরোভাগে রাখিয়া, চির-দাসীভাবে নিকটে থাকিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারিলেই আপনাকে এ জীবনে সৌভাগ্যবতী মনে করিয়া তৃপ্তিলাভ করিত, আজ কমলা নিজের স্বামী নলিনাক্ষের হাতে শ্বশ্রূদেবীর চরণ পূজার জন্য 'স্থলপদ্ম' পাইয়া দেব-দুর্লভ নন্দনকানন-জাত পারিজাত-জ্ঞানে ভক্তিভাবে গ্রহণ করিল।

নলিনাক্ষ ও কমলা দুইজনে ক্ষেমঙ্করীর গৃহে প্রবেশ করিয়া ভক্তিভাবে সাশ্রুনয়নে তাঁহার চরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিল।

ক্ষেমঙ্করী সহসা এরূপ দেখিয়া চকিতা হইবার পূর্বেই নলিনাক্ষ কমলার ↦আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।↤

নলিনাক্ষের মাতা ক্ষেমঙ্করী ↦আনন্দাশ্রুপ্লুত নয়নে কহিলেন↤ "মা কমলা, তুমি যখন আসিয়াছিলে তখনই কেন এ পরিচয় দাও নাই? দুইদিন আগে সুখে তোমাদের ঘরকন্না দেখিয়া আরো সুখী হইতে পারিতাম।"



সাবিত্রী-
যেমন আপনার হৃদয়ের তপস্যা দ্বারা
সত্যবান উদ্ধার করিয়াছিল, বেহুলা যেমন
স্বীয় অলৌকিক ধৈর্য্য এবং ত্যাগের দ্বারা
পতিমুখ দর্শন পাইয়াছিল এবং সত্যের
জন্য তপস্যা করিয়া আপনার মর্যাদা
হইতে দময়ন্তীকে আশ্রয় করিয়া
সাবিত্রী ফিরেও রমণীর জীবন্ত হৃদয়ের
স্বামীভক্তি দিয়া এবং পতিভক্তি দ্বারা
আর স্বামীকে লাভ করিল। এই
মিলন বহুকালের পর সাবিত্রী ... দেবী
... মৃত্যুঞ্জয়ী বিজয় দান।

সুতরাং বেহুলা তাহা মৃত্যুকে জিতিল।

সং বীরেই ... জানিত

... যে, সতীর তপস্যা তাহা
হইবার নহে।

২

রমেশ খুড়ামহাশয়ের নিকট হইতে বিদায় লইয়া স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। কাশীনগরী তাহার চিত্ত বিনোদন করিতে পারিল না। সেই বহুজনসমাকীর্ণ নগরের সৌধমালার প্রতি সে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিত না। যেদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সেই দিক হইতেই যেন এক তীব্র বিষজ্বালা আসিয়া তাহার হৃদয়কে ব্যথিত করিয়া দেয়। অব্যক্ত চিন্তাগ্নি নৈরাশ্যের অনুকূল ঝঞ্ঝাবায়ুতে প্রজ্বলিত হইয়া তাহার হৃদয়কে দগ্ধ করিতে লাগিল।

রমেশ অতিকষ্টে ধীরে ধীরে পুণ্যসলিলা গঙ্গার তীরে আসিয়া মণিকর্ণিকার ঘাটে আশ্রয় লইল। পূতসলিলা গঙ্গা মানুষের জন্মজন্মান্তরের পাপপঙ্ক প্রক্ষালন করিয়া পবিত্র করিতে পারেন, কিন্তু রমেশের চিন্তাগ্নি নির্বাপণ করিতে পারিলেন না।

অতীত ঘটনাবলী ক্রমে ক্রমে রমেশের স্মৃতিপথে উদিত হইতে লাগিল! সেই ঘোর দুর্দিনে তাহার মৃত্যু হইল না কেন? যদি বা জীবনের রক্ষা হইল, তবে শান্তি পাইল না কেন? এই অশান্তিপূর্ণ জীবন বহন করিবার জন্যই কি ভগবান তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন? এই ভাবের কত যে প্রশ্ন-তরঙ্গ রমেশের হৃদয়ে উত্থিত হইতে লাগিল ⟼তাহা কে বলিবে।⟻ কে তাহার প্রশ্নের উত্তরদানে সান্ত্বনা প্রদান করিবে?

⟼কমলার কোমল প্রাণকে সে কতবার নিষ্ঠুরভাবে

* কমলার কোমল হৃদয়কে সে ভিতরে নিষ্ঠুরতার
আঘাত করিয়াছে; সে তাহার
অনিচ্ছাকৃত হইলেও এই চিন্তা তাহাকে বারংবার
পীড়ন করিতে লাগিল যে, কেন সে কমলাকে
পল্লীগ্রামের একটা অনাবশ্যক কুৎসিত চালে
তাড়িত করিয়া এতখানি কষ্ট দিয়াছে, কেন
সে বলে নাই "ওগো আমি তোমার
স্বামী নই; তুমি পতিহীনা অবলা।"
যে সম্বন্ধটির সম্মুখে অবৈধ সম্বন্ধের ভিতর
দেবতার ও কুলস্ত্রীর ন্যায় সত্য
বিবাহসম্বন্ধ কমলাকে লাভ করিয়া
সেই সম্পর্কটাকেই সে যে সেই সুখকে
প্রত্যক্ষ ভোগ করিতে দিয়াছে এইরূপ
বারংবার তাহাকে সংকুচিত
করিয়া তুলিল। কমলা ত রমেশের
প্রকৃত ধর্মপত্নী নহে; তবু কেন সে
অসংকোচ ভাবে তাহার কর্তৃত্বাদি
করিল? কেন সে তাহার প্রভুত্বভার
প্রতিবাদ করিল না?

আঘাত করিয়াছে। সে তাহার অনিচ্ছাকৃত হইলেও এই চিন্তা তাহাকে বারংবার দগ্ধ করিতে লাগিল যে, কেন সে কমলাকে পত্নীত্বের একটা অনাবশ্যক রহস্যজালে জড়িত করিয়া এতকাল কষ্ট দিয়াছে, কেন সে বলে নাই "ওগো, আমি তোমার স্বামী নই ; তুমি পতিহীনা অবলা।"

যে গঙ্গানদীর বালুচরে রজনীর নিবিড় অন্ধকারের ভিতর দেবতার পূজার ফুলের ন্যায় সদ্য বিকাসোন্মুক্ত কমলাকে লাভ করিয়া সেই গঙ্গার বক্ষেই সে যে সেই পুষ্পকেই ব্যর্থভাবে ভাসাইয়া দিয়াছে এই কথা বারংবার তাহাকে সংক্ষুব্ধ করিয়া তুলিল। কমলা ত রমেশের পূজার জন্য নহে, তবু কেন সে অযাচিত ভাবে তাহার করুণা গ্রহণ করিল ? কেন সে তাহার প্রত্যুপকার করিতে পারিল না ?↤

↦তবুও↤ যে ↦রমেশ↤ কমলার ↦কতকটা↤ উপকার করিতে পারিয়াছে, ইহা স্মরণ করিয়া সে একটু তৃপ্তি অনুভব করিল, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার স্বহস্তে লিখিত একখানি পত্রের কথা স্মরণ করিয়া বিশেষ আত্মগ্লানি ভোগ করিতে লাগিল।

↦এই সমস্ত ঘটনাপুঞ্জের সহিত↤ তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমার কথা ↦তাহাকে আরো অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল।↤

মানুষ একবার যাহা কর্তব্য বলিয়া নির্ধারিত ↦করে বহু বাধা সত্ত্বেও সে↤ তাহা ভুলিতে পারে না। বৃদ্ধা পিতামহী তীর্থবাসে আসিয়া কি ভাবে আছেন জানিবার জন্য রমেশের প্রাণ একটু ব্যাকুল ↦হইয়া উঠিল।↤ সে তাঁহার নিকট বৃন্দাবনে গিয়া বাস করিবার সঙ্কল্প করিতে লাগিল।

↦কিয়ৎকাল পরে রমেশ স্বীয় গতজীবনের সমস্ত অপরাধ সমস্ত গ্লানিকে গঙ্গাতীরে অঞ্জলি ভরিয়া ভাসাইয়া দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু খোদিত প্রস্তরখণ্ডকে লিপিশূন্য করিবার প্রয়াসে তাহাকে বারংবার ধৌত করিলে যেমন খোদিতলিপি অধিকতর স্পষ্ট হইয়া

'কিয়ৎকালপরে রমেশ স্বীয় সতীর্থদের
সমস্ত অপরাধ সমস্ত গ্লানিকে গঙ্গাতীরে
অঞ্জলি ভরিয়া ভাসাইয়া দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু
~~যে~~ যেদিকে প্রস্তুত মনকে নিষিক্ত করিবার প্রয়াসে
তাহাকে বারংবার স্নাত করিলে যেমন ~~[illegible]~~ খোদিতলিপি
~~[illegible]~~ অবিকৃত স্পষ্ট হইয়া উঠে রমেশের স্মৃতিপটে
সতর্কবাণী তেমনি আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল।
সে চোখ বুঁজিয়া কহিল, "বাঁচাও, বাঁচাও আমায়
এই যন্ত্রণার হইতে বাঁচাও!"

উঠে রমেশের স্মৃতিপটে গত ঘটনাগুলি তেমনি আরও জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিল। সে চোখ বুঁজিয়া কহিল, "বাঁচাও, বাঁচাও, আমায় এই কারাগার হইতে বাঁচাও!"⇐

⇒এমন সময় সে⇐ শুনিতে পাইল অদূরে একজন ভিখারী গাহিতেছে—

সময় থাকিতে ডেকে রাখো, মন,
যশোদা-জীবন নন্দ-দুলালে।
হরিনাম বিনা পরিণামে তোর
বুক ভেসে যাবে নয়নের জলে॥
সংসার-যাতনা এড়াবিরে যদি,
অনায়াসে পার হবি ভব-নদী,
অগতির গতি পতিত-পাবন—
দাঁড়াও, মন, তাঁর শ্রীচরণতলে।

গানটি একবার শুনিয়া রমেশের মনের তৃপ্তি হইল না, অনুরোধ করিয়া আবার শুনিল।

সুক্ষেত্রে সুবীজ রোপণ করিলে তাহা যেমন সময়ে সুফল প্রদান করিয়া থাকে, ⇒মানুষের চিত্তক্ষেত্রও যখন প্রস্তুত থাকে তখন একটা সামান্য উপলক্ষ্য আসিয়া তাহাকে মাতাইয়া দেয়। হিমালয়ের উচ্চ চূড়াভাগে যে সকল জলভরা মেঘ ঘুরিয়া বেড়ায় তাহারা একটু দক্ষিণে হাওয়ার স্পর্শ পাইলেই অমনি জল আকারে পৃথিবীতে পতিত হয়। তাহার সমস্তই প্রস্তুত থাকে কেবল ঐ দক্ষিণে হাওয়াটুকুর জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। রমেশের মনে ঐ গানের সুরটা কেবলি ফিরিয়া ফিরিয়া বাজিতে লাগিল। ঐ "সময় থাকিতে ডেকে রাখো, মন।" কিন্তু রমেশের সময় ত বহিয়া গিয়াছে; নদীর তরঙ্গকে ত আর তাহার প্রতিকূল-দিকে ফিরানো যায় না! রমেশের হৃদয়ে ক্রমশঃ

মনুষ্যের চিত্তসমুদ্র যখন প্রশান্ত থাকে তখন
একটা সামান্য উপলক্ষ্য আসিয়া
তাহাকে নাড়াইয়া দেয়। হিমালয়ের উচ্চচূড়াভাগে
যে সকল শিলাচয় মেঘলোকে দুলিয়া
থাকে তাহারা একটু নাড়িলে হঠাৎ স্থানভ্রষ্ট হইলেই
অমনি ভীম আকারে পৃথিবীতে পতিত হয়।
তেমনি সমস্তই প্রস্তুত থাকে কেবল ঐ নাড়িবার হাত বাড়াইবার
জন্য অপেক্ষা করিতে হয়। ছেলেবেলা মনে হইতে ঐ
নৌকার দুইটা কোণা বিঁধিয়া রহিতে লাগিল।
ঐ "সময় থাকিতে ভেবে দেখো মন" কিন্তু
বালকের সময় ও বুদ্ধি গিয়াছে; নদীর
তটকে ও আর তাহার প্রতিকূল-দিকে ফিরানো
যায় না! বালকের হৃদয়ে এখন একটা
উৎকট অনুতাপ-অনুভব আসিয়া উপস্থিত
হইল। সে ভাবিল, এতদিনও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিয়াছি-
আজ যদি জ্যাঠার দুষ্টামীতে তাহার ছেলেকে
কাঁদাইতে থাকি ও আমার জীবন ধন্য হইবে!
সে হৃদয়ে তাহার সংকল্প দৃঢ়
ঐ কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিয়া রহিল
করিয়া রাখিল/ যে সে ভাবে/ *

একটা বৈরাগ্যের তপঃক্লিষ্ট রুক্ষভাব আসিয়া ছায়াপাত করিল। সে ভাবিল, এতদিন ত নিরাশ্রয় হইয়া কাটাইয়াছি, আজ যদি ছায়াময় সুশীতল তপস্যার তরুতলে দাঁড়াইতে পারি ত আমার জীবন ধন্য হইবে! সে হৃদয়কে বারংবার গঙ্গোদক দ্বারা ঐ কাঠিন্যের জন্য অভিষিক্ত করিয়া স্থির করিয়া ফেলিল যে সে তাহার বৃদ্ধা পিতামহীর সহিত বৃন্দাবনধামে বাস করিয়া জীবনের অবশিষ্ট সময় "জয় রাধে শ্রীরাধে" বলিয়া কাটাইয়া দিবে। শুধু সাধনা ও সেবাধর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াই সে জীবন অতিবাহিত করিবে।

৩

রমেশের বৃদ্ধা ঠাকুরমা হরসুন্দরী আজ কয়েক মাস হইতে তীর্থ-বাস উপলক্ষ্যে বৃন্দাবনধামে আসিয়া বাস করিতেছেন। এই দূরদেশে আসিয়াও তাঁহার মনে শান্তি নাই। বৃন্দাবনধামে রাধারাণী দর্শনে অনেকেই সুখী হইয়া থাকেন। কিন্তু পুত্র-বিয়োগ-বিধুরা হরসুন্দরী কোনোরকমেই শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ক্রমেই তাঁহার শরীর ক্ষীণ হইতে লাগিল। জীবনের একমাত্র অবলম্বন প্রিয়পুত্রের দৈব-দুর্বিপাকে আকস্মিক মৃত্যু এক মুহূর্তের জন্যও তিনি বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। মৃত্যুর পূর্বে পুত্রের মুখদর্শন করিতে না পাওয়ায়, অনেক সময়ে কত কাল্পনিক কথা তাঁহার মনের মধ্যে আসিয়া আরো দুঃখ বৃদ্ধি করিয়া দিত।

মৃত্যুর সময়ে পুত্র না জানি কতবার "মা" "মা" বলিয়া ডাকিয়াছে, না জানি জলমগ্ন অবস্থায় কতই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছে, এই সমস্ত কল্পনা করিতে করিতে বৃদ্ধা দুঃখে বিহ্বল হইয়া পড়িতে লাগিলেন।

আশা ও কল্পনা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কার্য করিয়া থাকে। আশা সুখসহচরী, সে কাহাকেও দুঃখ দিতে জানে না। কল্পনা সুখ ও দুঃখ উভয়েরই অনুগামিনী, সে সুখের সময়ে সুখ এবং দুঃখের সময়ে দুঃখ বৃদ্ধি করিতে পারে। কল্পনা বৃদ্ধাকে তাঁহার অগোচরে-ঘটিত ঘটনাবলী স্মরণ করাইয়া মৃতবৎ করিতে লাগিল।

এই সমস্ত শোক-দুঃখের মধ্যেও হরসুন্দরী কখনো কখনো একটু শান্তি পাইতেন। বৃন্দাবনে তিনি যে পরিচারিকাটি পাইয়াছিলেন, সময়ে সময়ে তাহার নিকট মনের দুঃখ জানাইয়া দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়কে একটু লঘু করিতেন। পরিচারিকাটি বয়সে বালিকা হইলেও বৃদ্ধার মনোবেদনার অংশ গ্রহণ করিবার শক্তি তাহার ছিল।

বৃদ্ধা যাঁহার বাড়ীতে ছিলেন, সেই ব্রজবাসীর নাম বলদেবঠাকুর। বলদেবঠাকুরের স্ত্রী এবং সন্তানসন্ততি কেহ ছিল না, একমাত্র পালিতা কন্যা ব্রজবালা নিজের ব্যবহার-গুণে তাঁহার মন-প্রাণ অধিকার করিয়াছিল।

বলদেবঠাকুরের যাত্রী এখন আর তত বেশী আসে না। যে দুই-এক ঘর বাঁধা আছে, তাঁহারাই আসিয়া থাকেন। হরসুন্দরী বহুদিনের পুরাতন যাত্রী, বৃদ্ধ বয়সে পুনরায় আসায় ব্রজবাসী নিজের বাড়ীতেই তাঁহাকে অবস্থান করিতে দিয়াছিলেন। তাঁহার কন্যাই যথাসাধ্য হরসুন্দরীরও সেবা-শুশ্রূষা করিত।

ব্রজবালার ব্যবহারে সকলেই তাহাকে ভালবাসিত। বৃন্দাবনের বানরগুলিও ব্রজবালার আজ্ঞাবহ হইয়াছিল। ব্রজবালার জিনিসের অভাব ছিল না। সে বহু বানরকে খাদ্যদ্রব্য দিয়া বেশ বশীভূত রাখিয়াছিল। তাহার গুণ-মুগ্ধ সঙ্গিনী অন্যান্য ব্রজকুমারীরা তাহার কার্যকলাপ দেখিয়া তাহাকে রাধারাণী বলিয়াও ডাকিত।

ব্রজবালা হরসুন্দরীর ↦পাকের আয়োজন↤ করিয়া দিত। তাঁহার আহার হইয়া গেলে, থালাবাসন মাজিয়া দিত ↦এবং দ্বিপ্রহরে↤ বৃদ্ধার কাছে বসিয়া কোনো দিন রামায়ণ কোনো দিন বা মহাভারত পড়িয়া শুনাইত।

হরসুন্দরী মনঃকষ্টের মধ্যেও ব্রজবালার এই সমস্ত গ্রন্থাদি পাঠে মনে ↦কথঞ্চিৎ↤ শান্তি লাভ করিতেন।

বৃদ্ধা একদিন কথায় কথায় ব্রজবাসীর নিকট ব্রজবালার

গুণকীর্তন করিয়া সবিশেষ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, বলদেবঠাকুর সাশ্রুলোচনে বলিলেন, "ইহার পূর্বনাম সুশীলা, আমি ব্রজবালা নাম দিয়াছি। মা রাধারাণী ইহাকে মিলাইয়া দিয়াছেন। আমি সেবার যখন পূর্বদেশে যাত্রী সংগ্রহ করিতে গিয়াছিলাম, সেই সময়ে নৌকাযোগে যাইতে যাইতে একদিন হঠাৎ খুব ঝড়বৃষ্টির মধ্যে পতিত হই। সেইদিন কত লোকের কত সর্বনাশ হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু রাধারাণী ইহাকে আমার নৌকার নিকটে আনিয়া দেন। তখন হইতেই আমি ইহাকে কন্যা-নির্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছি। এই ব্রাহ্মণকন্যার জন্য আমার মনে বড় কষ্ট হয়। ভগবান ইহাকে জগতের প্রধানতম সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন!

"সুশীলা বাল্যকালে পিতৃহীনা হইয়া একমাত্র বিধবা মাতার যত্নে পালিতা হইয়াছিল। মাতা বহু চেষ্টায় যাহার সহিত ইহার বিবাহ দিয়াছিলেন, বিবাহের পরেই ভগবান তাহাকে নদীর প্রবল স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছেন।

"আমি যখন এই সুশীলাকে প্রথম দর্শন করি, তখন ইহার নব-পরিণীতার চিহ্ন দেখিয়া নদীর তীরে তীরে অনেক দূর পর্যন্ত খুঁজিয়াছিলাম, কিন্তু আর কাহাকেও দেখিতে পাই নাই। পরের দিন সুশীলা আমার সঙ্গে নৌকাযোগে গমন করিতে করিতে দুটি শবদেহ দেখিতে পাইয়া হঠাৎ কাঁদিয়া বলিল, 'ঐ পুরুষ-মৃতদেহ আমার শ্বশুরের এবং ঐ স্ত্রীলোকটি আমার মা।' পথিমধ্যে আর কাহারো সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমি সেই জন্য আজো ইহাকে সধবাভাবে রাখিয়াছি।

"অনেক সময় মনে করি, আর একবার পূর্বদেশে গিয়া ইহার পিতা ঈশানবাবুর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে কেহ আছেন কিনা অনুসন্ধান করিব। কিন্তু তাহার ↦আর↤ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারি না। আমার বোধ হয় উহার স্বামী জীবিত থাকিতে পারেন।"

বৃদ্ধা হরসুন্দরী ব্রজবাসীর মুখে সুশীলার বিবাহ-অন্তেই বিপদ

হওয়ার ঘটনা শুনিয়া ⟼কাতর হইয়া⟻ কাঁদিতে লাগিলেন। এই কথাগুলি অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় বৃদ্ধার দুঃখ বৃদ্ধি করিল। যাহার সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখের মিল হয় তাহার নিকট অযাচিত হইয়াও মানুষ মনের কথা না জানাইয়া থাকিতে পারে না। হরসুন্দরীও আর থাকিতে পারিলেন না। রমেশের বিবাহই তাঁহার পুত্রশোকের মূলীভূত কারণ।

⟼এই দুঃখের নিবৃত্তি বৃদ্ধার চিতাভস্মের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। অপর কিছুতেই এই দারুণ অনল নিভিবার নহে।⟻

বৃদ্ধা হরসুন্দরী ব্রজবাসীকে, কহিলেন "মানুষের কখন কি দুর্ঘটনা ঘটে বলিতে পারা যায় না; আমার একমাত্র পৌত্র রমেশ বিবাহ করিয়া বধূসহ বাড়ীতে আসিল, কিন্তু আমার পুত্র আর ফিরিল না। ব্রজবাসীঠাকুর, সুশীলা নামটিই খুব অপয়া। আমার সেই নাতবৌর নামও সুশীলা এবং তাহার বাপের নাম ঈশান ছিল। সেও বিবাহের পরেই তাহার শ্বশুর এবং মাকে জন্মের মত হারাইয়াছে।"

সুশীলা নিকটে দাঁড়াইয়া এই সব কথা শুনিতেছিল। শুনিতে শুনিতে সহসা তাহার চিত্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, কিন্তু তন্মুহূর্তেই জলবুদ্বুদের ন্যায় চিত্তের সেই উৎফুল্লতা চিত্তেই মিলাইয়া গেল।

বর্তমানের নিকট তাহার অনুমান টিকিতে পারিল না। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, এই রমেশই তাহার স্বামী; কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার বধূসহ গৃহে প্রত্যাগমন সংবাদে হতাশ হইল। তবে এই রমেশকে একবার দেখিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইল।

হরসুন্দরীও এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে রমেশকে দেখিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বৃন্দাবন তাঁহার আর ভাল লাগিল না, তিনি বাড়ী ফিরিবার সঙ্কল্প করিলেন।

৪

অন্নদাবাবু পুত্র যোগেন্দ্র এবং কন্যা হেমনলিনীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। যোগেন্দ্র পিতার অনুরোধে বাঁকীপুর যাওয়া বন্ধ রাখিয়াছিলেন।

অন্নদাবাবুর স্বাস্থ্য ক্রমে ভগ্ন হইতে লাগিল। অম্লের পীড়া তাঁহার জীবনের সঙ্গী হইয়া উঠিল। হেমনলিনীর বিবাহ দিবার জন্য অন্নদাবাবু ও যোগেন্দ্র বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারিলেন না।

হেমনলিনীর মন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিলেই বোধ হয় সে তাহার হৃদয়কে বেশ প্রশান্তভাবে গঠিত করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি তাহার মনকে এখন আর গর্বিত করিতে পারে না। সে শোক-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিতে করিতে তাহার হৃদয়কে এমন দৃঢ়ভাবাপন্ন করিয়াছে যে, সহসা তাহা আর বিচলিত হইবার নয়।

নলিনাক্ষের নিকট হইতে যে উপদেশ পাইয়াছিল হেমনলিনী তাহা আর বিস্মৃত হইতে পারে নাই। সে এখন স্বহস্তে পুষ্প চয়ন করিয়া সচন্দনে ভক্তিভাবে ভগবানের অর্চনা করিয়া থাকে। এখন তাহাকে আর পূর্বভাবে দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন আর হেমনলিনী চা-পান-সভায় যোগদান করে না। শিল্পকার্যে এখন আর তাহার মন আকর্ষণ করে না। এসব তাহার নিকট তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল। এসব বৃথা কাজে সময় নষ্ট না করিয়া একাকী

ঘরের কোণে বসিয়া একান্তমনে ভক্তিভাবে ভগবানকে ডাকিয়াই সে আনন্দ অনুভব করিত। ➡হেমনলিনীর এই পরিবর্তন তাহার স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি হইতেই হয়ত সংঘটিত; নলিনাক্ষের সুদৃঢ় এবং নিষ্ঠাবান হৃদয় তাহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল সন্দেহ নাই। সে তাহার হৃদয়ের কথারই সাড়া নলিনাক্ষের মুখ হইতে শ্রবণ করিয়া আপনাকে এমন কঠিন ব্রতে ব্রতী করিতে সাহসী হইয়াছিল। সমুদ্রের চঞ্চল তরঙ্গ যেমন তীরস্থ সুদৃঢ় পর্বতের পাদদেশে লাগিয়া ভাঙ্গিয়া যায়, হেমনলিনীর চঞ্চল হৃদয়ের তরঙ্গও নলিনাক্ষের তপস্যাপূর্ণ সুদৃঢ় জীবনের সংস্পর্শে আসিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। তৎপরিবর্তে হেমনলিনীর হৃদয় মহাম্বুধির ন্যায় একটি দিগন্তব্যাপী শান্তি এবং প্রসন্নতায় প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু সমুদ্রের তরঙ্গ ত পর্বতের অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না; তীরে যাহাই থাকুক না কেন তাহারই উপর সে আপনাকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দেয়। সুতরাং নলিনাক্ষ অন্নদাবাবুদের বাটীতে না আসিলেও হয়ত হেমনলিনীর জীবন পূর্বোল্লিখিত সাধনার পথ অনুসরণ করিত। নলিনাক্ষ নামক এক ব্যক্তি উপলক্ষ হইয়া সেই পথে সাহায্য করিল মাত্র।⬅

অন্নদাবাবুর জন্য সে দুই বেলা পূর্বের ন্যায় চা প্রস্তুত করিয়া দেয়। বৃদ্ধ পিতার যাহাতে যত্নের ত্রুটি না হয়, সে সম্বন্ধে হেমনলিনীর বিশেষ লক্ষ ছিল। অন্নদাবাবুর জন্য রান্না করিয়া দিয়া তাঁহার আহারান্তে সে স্বহস্তে প্রস্তুত হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিল। পোষাকপরিচ্ছদের জাঁকজমক তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বোধ হইতে লাগিল। দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যা হেমনলিনীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে না। এখন তাহার হৃদয় ভগবদ্ভক্তি লাভে একটু সমর্থ হইয়াছে।

যে রমেশের জন্য একদিন হেমনলিনীর প্রাণ উধাও হইয়াছিল, এখন আর তাহার জন্য প্রাণে কোনো আঘাত সহ্য করিতে হয় না।

হেমনলিনীর এই ভাবান্তর
অন্যের স্বাভাবিক মনোবৃত্তি
হইতেই স্বতঃ সংঘটিত; নলিনাক্ষেরও
সুদৃঢ় এবং নিষ্ঠাবান মনও তাহাকে
যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল সন্দেহ
নাই। [illegible]
[illegible] যে তাহার মনের জোরেই
আজ নলিনাক্ষের মুখ হইতে শুনিবা
মাত্র অকস্মাৎ এমন কঠিনরূপে
প্রতিহত [illegible] সাহসী হইয়াছিল)
[illegible] সমুদ্রের তীরে
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] নারীর [illegible] তাহার মন
[illegible], হেমনলিনীর
[illegible] ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও নলিনাক্ষের
অসম্পূর্ণ সুদৃঢ় নীরব সংস্পর্শে আপনার
তাহার দেন। সেই জন্যই হেমনলিনীর
[illegible] তাহার [illegible]
একটি [illegible] শান্তি এবং প্রসন্নতায়
প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কিন্তু সমুদ্রের
তরঙ্গ ও [illegible] অপেক্ষায় কাহার
থাকে না, [illegible] তাহাকে যাহার
যাত্রী না হোক তাহারই উপর যে আপনাকে
নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দেয়। সুতরাং
নলিনাক্ষ মনের দুর্বলতা [illegible] না আপনার
[illegible]
[illegible] হেমনলিনীর
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] শক্তি। নলিনাক্ষ [illegible]
[illegible] [illegible]
[illegible] হইয়া সেই ভাবে সাহায্য করিল
[illegible]।

তবে রমেশকে কাশীতে দেখিয়া তেমন অবজ্ঞা প্রকাশ করা তাহার উচিত কার্য হয় নাই। এইজন্য সে মনে মনে খুব কষ্ট অনুভব করিতে লাগিল। যাহাকে একদিন প্রাণের সহিত ভালবাসিত, নিজের স্বার্থসিদ্ধির অভাবে, সেই প্রিয়জনের প্রতি না বুঝিয়া অন্যায় দোষারোপ করার জন্য হেমনলিনী নিজেকে খুব দোষী মনে করিতে লাগিল। রমেশের একবার দেখা পাইলে সে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে বলিয়া স্থির করিল। ↦হেমনলিনী মনে করিত, রমেশের সমস্ত লাঞ্ছনা এবং অপমান যেন তাহারই জন্য; তাহারই জন্য যেন এক অপরিচিত যুবক আপনার তরুণ হৃদয় লইয়া ব্যথায় ফাটিয়া পড়িতেছে। বাহিরের সমস্ত গোলযোগ যেন তাহারই কর্তৃক সংঘটিত। এই মনে করিয়া সে একান্ত অভিভূত হইল। বাঁশীতে ফুৎকার দিলে তাহা যেমন বাঁশীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজিয়া উঠে, হেমনলিনীর জীবনেও বিধাতা যে সুর বাজাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাহা এই সমস্ত অপরাধ এবং গোল-যোগের ছিদ্র পাইয়া দ্বিগুণ স্বরে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। এই সুমধুর দুঃখের রাগিণী আর কেহ বুঝিতে পারিল কিনা↤ ↦জানি না কিন্তু হেমনলিনী বুঝিল, তাহার জীবনে স্বয়ং ওস্তাদ্ আসিয়া বাঁশী বাজাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যথা জীবনটা যে বেদনায় ছিদ্র-বিহীন বাঁশীর মত ফাটিয়া চুরমার হইয়া যাইত। হেমনলিনী তাই দুই বেলা প্রার্থনা করিত—“হে বিধাতা! তুমি আমার প্রাণে যে সুর বাজাইয়া তুলিতেছ, সে সুর রক্ষা করিবার নিমিত্ত যেন অপরের জীবন বেসুর ও বেতালা না হয়। অন্যকে যেন আমি আঘাত না করি।”↤



প্রেমশালী মনে করিত,
রমেশের [illegible] সমস্ত লাঞ্ছনা এবং অপমান যেন
তাহারই নয়; তাহারই নয় যেন এক অপার্থিব পুরুষ সমস্ত
কাঁধে লইয়া ধুলায় [illegible] কাঁদিয়া মরিতেছে। তাহিতেই সমস্ত
[illegible] লাঞ্ছনা যেন তাহারই বুকে সংগঠিত। এমনে
কাহার না এমন অধিকৃত হইল। হাঁসিতে [illegible] দুঃখের দিনে
তাহার মনের কামনা [illegible] একটু একটু জাগিয়া উঠিত; [illegible]
[illegible] প্রেমশালীর জীবনের নিশান যে দুঃখ জাগাইয়া উঠিত
~~[illegible]~~ তাহা কাঁদাইতেছিলেন তার ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~
ও এই সমস্ত অপমান এবং প্রেমশোকের ছিদ্র ভরিয়া নিরন্তর দৃষ্টি দিয়া
উঠিত না। এই [illegible] সুন্দর, হৃদয়ের প্রাণিনী সম্পর্কে প্রতীতে [illegible]

কাটে না কিন্তু হেমাঙ্গিনী ভুলিল,
তাহার জীবনে দুঃখ
উপস্থিত আসিয়া তাঁহাকে নারাইতে সমস্ত
কাড়িয়া লো। সম্মুখে জীবনের যে
আশার প্রদীপটি তাহার মত
সাথীর চুমার হেম পাইত। হেমাঙ্গিনী
এই দুইবেলা প্রার্থনা করিত —
“হে ঈশ্বর! তুমি আমার স্বামীকে
সুখে রাখিয়া তুলিতেছ, সে সুখ
তুমি তাহার মনেও যেন অক্ষয়
জীবন কেবল ও বেদনা না হয়।
অন্যথা যেন আমি আমাতে না
করি।”

৫

রমেশ বৃন্দাবনে তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমার সাক্ষাৎকার লাভে বঞ্চিত হইয়া বাড়ী আসিল। রমেশ যখন বাড়ী আসিল, হর-সুন্দরী তখন পূজার ঘরে পূজা করিতেছিলেন। তাঁহার উপাসনার ঘরে প্রবেশ না করিয়া রমেশ বাহিরে একজন পুরাতন ভৃত্যের সহিত কথা বলিতেছিল। কথার শব্দ শুনিবামাত্র বৃদ্ধার ধ্যান ভঙ্গ হইয়া গেল, তাঁহার আহ্নিক আর হইল না। স্নেহের প্রবল স্রোতে ফুলচন্দন ভাসিয়া গেল।

⇒বিধাতা তাঁহার ধ্যানে তুষ্ট হইয়া রমেশকে স্বয়ং তাঁহার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। বৃদ্ধা ভাবিল আমার তপস্যা সার্থক হইয়াছে। আমার ঠাকুর প্রসন্ন হইয়া আমার ঈপ্সিত বরকে স্বয়ং পাঠাইয়া দিয়াছেন।⇐

তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিয়া রমেশের গলা জড়াইয়া ধরিলেন। রমেশ তখনো স্নান করে নাই। তার পরিধান-বস্ত্রের অপবিত্রতা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্র ব্রজমোহনের কথা পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া রমেশের মুখে মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহার মুখ চুম্বন করিলেন। চোখের জলে বুক ভাসিয়া গেল। রমেশ ক্রমে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল।

বৃদ্ধার শরীর খুব ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। রমেশ বুঝিতে পারিল, মৃত্যু তাঁহার নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে। সে ঠাকুরমাকে কাশী

যাইতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। বৃদ্ধা বধূর কথা জিজ্ঞাসা করিলে, রমেশ "তাহাকে কাশীতে রাখিয়া আসিয়াছি" বলিয়া ক্ষান্ত করিল।

একটি কথা বৃদ্ধার সহসা মনে হইল। তিনি কহিলেন, "রমেশ, তোমার বিবাহের দুর্ঘটনা কেবল আমাদিগকেই দুঃখ দিবার জন্য হইয়াছিল, ইহাই আমার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু দেখিলাম আমাদের মত হতভাগ্য লোক ঈশ্বরের রাজ্যে আরো আছে। আমি যে ব্রজবাসীর বাড়ীতে ছিলাম, সেই ব্রজবাসীর একটি পালিতা কন্যা আকস্মিক দৈব দুর্বিপাকে পতিতা হইয়া সর্বস্বান্তা হইয়াছে। সে মেয়েটির নামও সুশীলা এবং বাপের নাম ঈশান। বিবাহের পরেই সুশীলা পতিহারা হইয়াছে। আমাদের অপেক্ষা তাহাদের বিপদ আরো অধিক হইয়াছিল। ব্রজবালা সুশীলা এক সঙ্গে তাহার মাতা, শ্বশুর এবং স্বামী তিনজনকেই হারাইয়াছে। বলদেবঠাকুর নৌকাযোগে একবার যে সময়ে এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন সুশীলাকে কুড়াইয়া পান। ব্রজবাসীঠাকুরের আর সন্তান-সন্ততি কেহই নাই। সুশীলাকে তিনি কন্যানির্বিশেষে প্রতিপালন করিতেছেন। বৃন্দাবনের সকলে সুশীলাকে ব্রজবালা বলিয়া ডাকে। ব্রজবালাও ব্রাহ্মণকন্যা। যখন ব্রজবালার শ্বশুরের ও মায়ের মৃতদেহ নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল, তখন ব্রজবাসী তাহার শ্বশুরের গলদেশে পৈতা দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং তাহার মাতা যে বিধবা তাহাও তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। বাছা রমেশ, ব্রজবালাকে দেখিলে পাষাণও বিগলিত হইয়া যায়। তাহার আচার-ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট না হইয়া পারে না। এমন কি বৃন্দাবনের বানরগুলিও ব্রজবালার আজ্ঞাবহ। আমি অনেক মেয়ে দেখিয়াছি, কিন্তু ব্রজবালার মত এমন মেয়ে আর দেখি নাই। ভগবানের বিচার নাই, নহিলে তাহার মত মেয়েকে এত কষ্ট দিবেন কেন। ব্রজবালা কাহাকে পর বলে তাহা আদৌ জানে না;

বিধাতা তাঁহার দ্বারে
তুষ্ট হইয়া দুঃখকে স্বয়ং তাঁহার
~~[illegible]~~ নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।
বুদ্ধভাবিল আমার জন্য
সার্থক হইয়াছে। আমার প্রভু
প্রসন্ন হইয়া আমার শক্তিকে স্বয়ং
জাগাইয়া দিয়াছেন।

সকলেই তাহার আপন। আমাকে এত যত্ন করিত, বোধ হয় পেটের মেয়েতেও তাহা করিতে পারিবে না। ব্রজবালার ঋণ আমি শোধ করিতে পারিব না।"

রমেশ এই সকল ঘটনা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিল। ↦অন্ধকার রাত্রিকালে নিকষকৃষ্ণ আকাশপটে বিদ্যুৎপ্রভাকে কিয়ৎকালের জন্য বন্দী করিয়া রাখিলে সেই রাত্রির যেমন শোভা হয়, রমেশের হৃদয়েও ঐ ক্ষণপ্রভা-আশা এবার একেবারে বন্দী হইয়া ঠিক তদ্রূপ আনন্দপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে কেবলি একটি মন্ত্র জপ করিতে লাগিল, "সুশীলা আছ তুমি, সুশীলা থাকো তুমি।"↤ তাহার সর্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। রমেশের বৈরাগ্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া অনুরাগজল প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। রমেশ নিশ্চয় বুঝিল এই সুশীলাই তাহার বিবাহিতা স্ত্রী। বিবাহ-বিভ্রাটের আদ্যোপান্ত রমেশই ভাল জানে। রমেশের মনে আর কোনো সন্দেহ রহিল না। সুশীলার জীবন রক্ষার জন্য ভগবানকে মনে মনে শত ধন্যবাদ দিল। ↦অন্ধকার শ্মশানের নিবিড় শান্তির ভিতর ভিক্ষুরাজ হরিশ্চন্দ্র যেমন বিদ্যুতালোকে স্বীয় পত্নীকে চিনিতে পারিয়াছিলেন রমেশও তদ্রূপ আপনার কঠোর বৈরাগ্যের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের করুণাপাতের দ্বারা সুশীলার পরিচয় লাভ করিল। কিন্তু রমেশের মন যে সত্যই শ্মশানতুল্য হইয়া গিয়াছে ; সেখানে কোনো ভালবাসার চিহ্ন রেখাপাত করিতে পারে না। কিন্তু আজ যেন তাহার সেই বৈরাগ্যের অন্ধকার ভেদ করিয়া আশার বিজুলি ঝলক দিয়া উঠিল। এই অশনিশব্দে রমেশের সন্ন্যাসের আসন টলিয়া গেল। যে দেবতার জন্য সে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া ধ্যান-মগ্ন ছিল সেই দেবতা আজ যেন তাহার সম্মুখে মূর্তিমতী হইয়া আবির্ভূতা কিন্তু তবুও তাহা এখনও ছায়ামূর্ত্তি।↤ রমেশ ঠাকুরমার অনুসন্ধানে যেদিন বৃন্দাবন যায়, সেদিন রাত্রিতে ব্রজবাসীর বাড়ীতে তাহাকে থাকিতে হইয়াছিল। এক রাত্রিতেই ব্রজবালার

অন্ধকার রাত্রিকালে নক্ষত্রলোককে
নিকটতর আকাশপটে বিস্ময়ভাবে
~~যদি কেহ নিকটতম এমনি গাম্ভীর্যে~~
বিংশকালের জন্যে যদি কঠিন গাম্ভীর্যে সেই
তারি যেমন শোভা হয়, তেমনি
সংসারে ঐ স্বপ্ন-আকাশ প্রান্তে একেবারে
প্রদীপ্ত চিত্ত তোমার
আত্মসমর্পণ হয়ে উঠেছে। সে কেবলই
বলছে মন্ত্র তার কাছে শোনাতে
"তুমিই সত্য তুমি, তুমিই সত্য তুমি।"

অন্ধকার
মুখোসের ভিতরে মানুষ
ওঠে চিন্ময়ের হাসি যেন
কোনো লোক স্বীয় পত্নীকে
চিনিতে পারিয়াছিলেন কোনো রূপ
অন্ধকার কাটিয়া ছেলেদের ভিতর
দিয়া দুর্বল কোলাহলের
মধ্যে সুশীলার কাছে নাই হইল। কিন্তু
ছেলেদের মধ্যে সবাই মুখোসপরা
হইয়া দাঁড়ায়; যেখানে কোনো
ভালবাসার চিহ্ন দেখাইতে পাইতে
পারে না। কিন্তু আজ যেন হঠাৎ
সেই ছেলেদের অন্ধকার ভেদ করিয়া
আমাকে বিস্ময়ে চমকে দিয়া উঠিল।
এই একাকিনীকে
ছেলেদের সন্ধ্যাবেলা আসর ছাড়িয়া
গেল। যে ছেলের জন্য সে এত দীর্ঘকাল
তাহার প্রাণ দিল সেই ছেলে
আজ যেন তাহার সম্মুখে মূর্তিমতী
হইয়া আবির্ভূত কিন্তু তবু তাহা
অবাস্তব ছায়ামূর্তি।

পরিচর্যায় যে ভাবে ভক্তিশ্রদ্ধা পাইয়াছিল, তাহাতেই রমেশ তাহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়াছিল, আজ তাহা আরো বেশী হইয়া উঠিল। কিন্তু এখন আর সুশীলাকে পাওয়া রমেশের দুরাশামাত্র বোধ হইতে লাগিল। সুশীলা যে অবস্থায় জীবন যাপন করিতেছে, তাহাতে এখন সহসা এ পরিচয় দিলে লোকে শুনিবে না। তবে রমেশ সুশীলাকে সহধর্মিণী ভাবে পাইবার আশা একেবারে মন হইতে দূর করিতে পারিল না। সেই সাধ্বী আদর্শ রমণীকে অন্ততঃ আর একবার দেখিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার প্রবল হইল। রমেশ বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে পুনরায় বৃন্দাবন যাইবার জন্য অনুরোধ করিল এবং তিনিও তাহাতে সম্মতি দিলেন।

৬

ভগবান মঙ্গলময়। ↦তাঁহার বিধান↤ জীবের মঙ্গলের জন্য। বিবাহের শুভদৃষ্টির সময়ে রমেশ সুশীলার মুখ দেখে নাই। কিন্তু সুশীলা প্রাণ ভরিয়া তাহার তরুণ ↦মুখচ্ছবি↤ হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া ↦রাখিয়াছিল↤ রমেশের চোখে চোখ মিলিত হইলে সুশীলার দৃষ্টির পক্ষে মন একটি বাধা জন্মাইয়া দিত, কিন্তু রমেশ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকায় তাহার সে বাধা হয় নাই। সে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে স্থির নেত্রে দেখিয়া লইয়াছিল।

রমেশ ঠাকুরমার অনুসন্ধানে যখন বৃন্দাবন আসে, ব্রজবালা তখন তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল। স্বামী জীবিত আছেন, ইহাই তাহার পক্ষে অত্যন্ত সুখের বোধ হইয়াছে। রমেশ যখন সেখানে নিদ্রিতাবস্থায়, সুশীলা তখন নিজের মনকে স্থির রাখিতে পারে নাই, সে একটি প্রদীপ লইয়া রমেশের মুখ মনের মত দেখিয়া লইয়াছিল। এখন সুশীলার প্রাণে আনন্দের ↦সাহানা রাগিণীর সুর বাজিয়া উঠিল।↤ ↦কিন্তু পূজারিণী দেবমন্দিরে শত ধূপদীপ প্রজ্বলিত করিলেও পাষাণ প্রতিমা তাহার প্রতি যেমন দৃষ্টিপাত করে না; সুশীলার সমস্ত সেবাও তদ্রূপ রমেশের পাষাণধ্যানকে ভগ্ন করিতে পারিল না। সুশীলা বারংবার মনে করিল, যদি তিনি আমার হৃদয়েশ্বর না হন, তবে ত আমার এত পূজোপকরণ ব্যর্থ হইয়া যাইবে? কিন্তু পরক্ষণেই সে চিন্তা দূর হইল।↤

কিন্তু প্রবাসী [illegible], মত
দুর্দমনীয় প্রজ্বলিত কামনার
[illegible] আমার প্রতিমা ভেঙে দিতে
অসম্পূর্ণভাবে বলেন; সুনীতার সম্বন্ধে
সেরূপ ভাব রেখেছে আমার হৃদয়
কে এখন ও সহিষ্ণু সুনীতার
সংসার মনে করিল, যদি [illegible]
তিনি আমার হৃদয়ের না হন
তবে ও আমার এত দুঃখবোধ করিবার
কি [illegible] হইবে? কিন্তু অবশেষে সে
চিন্তা দূর হইল।

বলদেব ব্রজবাসীর অর্থের অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি একটু কৃপণ স্বভাবের লোক ছিলেন। অনেক সময়ে মনে করিতেন, ব্রজবালার পিতৃবংশে ও শ্বশুরবংশে কে আছে একবার অনুসন্ধান করিতে হইবে। রাত্রিতে যখন আফিং-এর নেশায় বেশ ঘিরিয়া ফেলিত, তখন মাটির হুঁকায় তামাক টানিতে টানিতে তিনি ব্রজবালার অদৃষ্ট-চিন্তায় মনোনিবেশ করিতেন, আর ব্রজবালা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া কখনো চরণসেবা কখনো বা মাথার →পাকা← চুল →তুলিয়া← দিত।

ব্রজবাসী সুশীলার স্বামীর সন্ধান পাইলে তাহাকেও নিকটে রাখিয়া নিজের পুত্রকন্যার স্থান পূর্ণ করিবেন, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কৃপণ স্বভাব এবং দীর্ঘসূত্রতার জন্য বাড়ীর বাহির হইতে পারিতেন না। দেখিতে দেখিতে ব্রজবালার রূপযৌবনও ক্রমে ফুটিতে আরম্ভ করিল। ব্রজবাসী আর নিশ্চেষ্ট ভাবে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

হরসুন্দরীর বৃন্দাবনধাম পরিত্যাগের কিছুদিন পরে ব্রজবাসী কাশীতে আসেন। বাড়ীতে লোকাভাবহেতু ব্রজবাসী →ব্রজবালাকে রাখিয়া কোথাও যাইতে পারিতেন না।← যখন যেখানে যাইতেন, কন্যাটিও তাঁহার সঙ্গে যাইত। ব্রজবালা কাশীতে আসিয়া সামান্য দিনের মধ্যেই তাহাদের বাসাস্থ প্রতিবেশিনীদিগের বিশেষ স্নেহ ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। সমবয়স্কা প্রতিবেশিনী-গণের অবকাশকাল ব্রজবালার নিকট অতিবাহিত হইত। ব্রজ-বালার কথা, আচার-ব্যবহার, পরিচ্ছদ ইত্যাদি অনেকটা বৃন্দাবন-বাসীর মত হইয়াছিল। তাহার একটি খুব নিকট প্রতিবেশিনীকে সে দিদি বলিয়া ডাকিত। দুইজনে খুব ভাব। দিদির শ্বাশুড়ীকে মা বলিত।

বৃদ্ধা ক্ষেমঙ্করী ব্রজবালার ব্যবহারে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি যখন গঙ্গাস্নান করিতে কি বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে যাইতেন,

ব্রজবালা এবং পুত্রবধূ কমলাও তাঁহার সঙ্গে যাইত। বলদেবঠাকুর বৃদ্ধা ক্ষেমঙ্করীর সহিত ব্রজবালার কোনস্থানে গমনাগমনে কোন বাধা দিতেন না, বরং ক্ষেমঙ্করী ও কমলার সঙ্গে ব্রজবালা মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারিলে তাঁহার একবার পূর্ববঙ্গ যাইবার সুবিধা হইবে মনে করিতে লাগিলেন।

ব্রজবালা এখন আর তেমন বালিকা নাই, এখন অনেক বিষয়ে সুবিধা অসুবিধা অনুভব করিতে শিখিয়াছে। তাহার পিতার আহারান্তে সে ভাত আনিয়া দিদি কমলার বাড়ীতে আহার করিত, কোনদিন বা কমলা ভাত লইয়া ব্রজবালার বাড়ী যাইত। দুইজনে একসঙ্গে মিলিত হইয়া আহার করিতে না পাইলে, তাহাদের তৃপ্তি হইত না। ব্রজবালা যেদিন যাহা রান্না করিত, তাহার একটু অংশ দিদি কমলাকে না দিয়া সে খাইত না। কমলা বাঙালীর মেয়ে বলিয়া তাহার কোন ব্যঞ্জনাদি ব্রজবালাকে দিতে পারিত না।

কমলা একদিন কহিল, "ভাই ব্রজ, আমার মা যদি পৃথক্‌ভাবে রান্না করিয়া দেন তাহা তোমার খাইতে আপত্তি আছে কি? বাঙালীর হাতে খাইলে দোষ কি? না হয় তোমার বাবাকে বলিও না, কারণ তিনি হয়ত নিষেধ করিতে পারেন।"

সুশীলা হাসিয়া উত্তর দিল, "দিদি, তার জন্য বাবার নিকট গোপন করিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। আমিও আগে বাঙালী ছিলাম, তখন আমার নাম ছিল সুশীলা।"

কমলা একটু মুচকি হাসিয়া কহিল, "ভাই ব্রজ, আজ হ'তে দুইজনে সই পাতাইলাম। মধ্যে আমারও একবার সুশীলা নাম হইয়াছিল, এখন আবার সেই কমলা নামই পাইয়াছি।"

দুই সই বেশ মেলামেশা চলিতে লাগিল। কমলা ব্রজবালাকে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইল। সুশীলার নামেমাত্র বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু স্বামী কি জিনিস এবং শাশুড়ীকে কি ভাবে

ভক্তিশ্রদ্ধা করিতে হয়, তাহা সে আদৌ জানে না। কমলার ব্যবহার দেখিয়া ক্রমে ব্রজবালা হৃদয়ে তাহা অঙ্কিত করিতে আরম্ভ করিল।

↦এই দুইটি সুশীলার কপালে বিধাতা যে একই লিপি লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহা তাহারা পরস্পর না জানিলেও অবস্থাগত ঐক্যের দ্বারা তাহারা নিজেদের ভিতর একটি পরম বন্ধু-ভাব অনুভব করিল। সুশীলা সংসারসুখ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; বুদ্ধিমতী সতী কমলা নিজের গতজীবনের সহিত তাহার জীবদ্দশার ঐক্য দেখিয়া বুঝিতে পারিলেন সুশীলার সুখের দিন আসন্ন। প্রবল সূর্যোত্তাপে ধরণী-বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইলে শ্রাবণের বারিধারার শীতল স্পর্শে তাহা পুনর্বার পূর্বাবস্থা লাভ করে। কমলা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল ব্রজবালার↤ ↦জীবনের দীর্ঘ নিদাঘকাল অবসানপ্রায়; তাহার জীবনাকাশে মেঘের আভাস দেখা দিয়াছে; বিধাতার করুণা বর্ষিত হইতে আর বিলম্ব নাই। সুশীলার এই মিলনোৎসবের জন্য কোন্ সরোবরে কোন্ কমল ফুটিতেছে কমলা তাহা জানিত না বটে কিন্তু তাহার সুগন্ধ সে নিজের পরীক্ষিত হৃদয়ের ভিতর অনুভব করিল।↤

দুই ছুটি সুশীলার [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] সেই [illegible]

অহঙ্কার না থাকিলেও অকস্মাৎ একেবারে চাপা দেওয়া যাইবে [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] অনুমান করেন। [illegible]

সুশীলা সংসারসুখ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ; বুদ্ধিমতী সতী

মেয়ে [illegible] [illegible] সহিত [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] সুশীলার মুখের দিকে [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

~~সুশীলার [illegible] [illegible]~~ [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

দীপকের দীপ-

নিদাঘকাল অবসানপ্রায়;
তাহার দীপকরাগে মেঘের
আভাস দেখা দিয়াছে; কিন্তু তাহার
কণ্ঠ এখনো হইতে আর কিছু নাই।
সুনীলার এই দীপকরাগ সকলের জন্য
কোন সন্ধ্যাতে কোন কোমল
মূর্ছনাতে কাঁপিয়া উঠে কথাটি না
বলে কিছু তাহার সুগন্ধে সে দীপের
অগ্নিশিখা তাহার ও ভিতর প্রভাত
করিল।

৭

বলদেব ব্রজবাসী ব্রজবালাকে কাশীতে ক্ষেমঙ্করীর নিকট রাখিয়া একবার পূর্ব্ববঙ্গ যাইবার মনন করিলেন, কিন্তু ↦যাত্রা করিবার পূর্ব্বেই তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া↤ পড়িলেন। ↦সুতরাং↤ ডাক্তার নলিনাক্ষবাবুর ↦ডাক পড়িল; তিনি বিশেষ যত্নের সহিত চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।↤ রোগ ক্রমশঃ ↦বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।↤ নলিনাক্ষবাবু ↦অপর↤ একজন ভাল ডাক্তারের ↦সহযোগে চিকিৎসার প্রস্তাব করিলে↤ ব্রজবাসী কহিলেন, "আমাকে মরিতেই হইবে, এ-সময়ে যাহা আছে আমার চিকিৎসায় ব্যয় করিলে আমার ব্রজবালার উপায় কি হইবে, আমার জন্য ↦কিছুই↤ খরচ করিতে হইবে না।"

বলদেবঠাকুরের শরীর বেশ শক্ত ছিল। ↦নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রাতরুত্থান এবং সুনিয়ন্ত্রিত পাঠ এবং আহ্নিকাদিতে এ পর্য্যন্ত তাঁহাকে কেহ একমিনিটও পশ্চাৎপদ হইতে দেখে নাই। তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত তিনি একটি ঠিক জীবন্ত ঘড়ির কল। অথচ এই বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকিয়াও তাঁহার উদার চিত্ত একটি অব্যক্ত মুক্তির আস্বাদ লাভ করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয়টি ছিল ঠিক একটি সুমার্জ্জিত মর্ম্মরপ্রস্তরের মন্দিরের ন্যায়। তিনি নিত্য প্রাতঃ ও সন্ধ্যাস্নান দ্বারা সেই মন্দির ধৌত করিয়া বিশ্বেশ্বরের পূজা করিতেন। হৃদয়ের অপরিসীম দয়া এবং দাক্ষিণ্য দ্বারা তিনি নিজের চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকদিগকে নিজের

করিয়া লইয়াছিলেন। এই তীক্ষ্ননাসা উজ্জ্বলচক্ষুষ্মান্ ব্রাহ্মণটির নিকট কাশীর নরপতি হইতে আরম্ভ করিয়া⇜ ⇝নরাধম বানর-গুলিও বশ্যতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ত্যাগের একটি উজ্জ্বল আদর্শ তাঁহার জীবনে নিত্য কার্য করিত। এই আদর্শই ব্রজবালাকে গঠিত করিয়া তুলিয়াছিল। রমেশের বৈরাগ্য এবং এই ব্রাহ্মণ-আশ্রিতা ব্রজবালার তপস্যা মিলিয়া একদিন ব্রজে যে যুগল-মূর্তি দেখা যাইবে বলদেব তাহাই নিজের চিত্তে ধ্যান করিতেছিলেন।⇜ কখনও জ্বর হইয়াছে কিনা ইহা তাঁহার স্মরণ হইত না। ক্বচিৎ কখনও একটু মাথা ধরিলে, কি গা-হাত-পা বেদনা হইলে আফিং-এর মাত্রা একটু বাড়াইয়া দিতেন। অনেকদিন পরে এবার তাঁহার জ্বর হইয়াছে। নলিনাক্ষবাবুর দ্বারা চিকিৎসাতে কোনই উপকার হইতেছে না দেখিয়া বলদেব তাঁহার দিন নিকট মনে করিতে লাগিলেন। কিন্তু তবুও ভাল ডাক্তার আনিতে দিলেন না।

ব্রজবালার আহার নিদ্রা নাই, দিবারাত্র পিতার পরিচর্যা করিতেছে। পিতার পার্শ্বে বসিয়া ভবিষ্যৎ জীবনের উপায় কি হইবে ভাবিতে ভাবিতে চোখের জলে তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ক্ষেমঙ্করী ও কমলা অধিকাংশ সময় নিকটে থাকিয়া ব্রজবালাকে অনেক বুঝাইয়া সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিত। কমলা খুব অনুরোধ করিয়া ব্রজবালাকে আহার করাইত, কিন্তু তাহার চোখের জলের বিরাম ছিল না। সে অসময়ে যাঁহার নিকট আশ্রয় পাইয়াছিল, আজ তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত; তাঁহার অভাবে কোথায় দাঁড়াইবে, এই ভাবিয়া সে আকুল হইল। ব্রজবালার এ সংসারে আর কেহই নাই; আজ তাহার বিধবা মাতার কথাও স্মরণ হইতে লাগিল, সে চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। তাহার মুখশ্রী ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত ম্লান হইয়া উঠিল।

⇝কিন্তু এই হতাশহৃদয়ের আশঙ্কাসন্তপ্ত বাষ্পরাশির কুহেলিকা ভেদ করিয়া সে একটি মূর্তি হৃদয়ে ধ্যান করিতেছিল। দূরাগত

(৫)

[illegible] সমাজ প্রা[illegible] ~~[illegible]~~
এই সুপরিচিত নাম এবং
আধুনিকদিগের অনেকেরই তাঁহাকে কেহ
এখানেও প্রকাশ্য হইতে
জ্ঞান নাই। তাঁহাকে দেখিলে
মনে হইত তিনি একটি ছিন্ন
~~[illegible]~~ কিছু ঘটিত হল। অথচ
এই বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকিয়াও
তাঁহার উদার চিত্ত একটি অপূর্ব মুক্তির
আস্বাদন লাভ করিয়াছিল। তাঁহার বাড়ীতে
ছিল একটি সুসজ্জিত মর্মর প্রস্তরের
মন্দিরের ন্যায়। তিনি নিত্য প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে
[illegible] সেই মন্দির [illegible] করিয়া ~~[illegible]~~ বেড়াইতেন।
দুবার করিতেন। তাহার অন্তরঙ্গ দল এবং
দাক্ষিণাত্যের আদি নিবাস ভক্ত [illegible]
লোকদিগকে নিজের ~~[illegible]~~ বাটীতে লইয়াছিলেন।
এই [illegible] [illegible] ব্রাহ্মসমাজ
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~
প্রথম হইতে আরম্ভ করিয়া

(খ)

পরবর্তী ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য-
বর্গের শক্তির কবিতে হইল
না। তাঁদের একটি বিশেষ
আদর্শ তাঁহার নিজের রীতি কাব্য করিত।
এই সময়েই প্রবাসীদের সাহিত্য-
চর্চার উন্মেষ হয়। একালের
বিশেষ এই এই প্রাচীন-আধুনিক
প্রবাসীর সমাজ বাঙালির একাধিক
প্রতি যে যুগান্তকারী দেখা
যাইত বাংলার তাহাই নীতির
চিত্ত দ্বারা ফোটাইতেছেন।

পথিক নিশীথরাত্রে দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের ভিতর যেমন সুদূরাগত আলোকবর্তিকার রশ্মিজাল সন্দর্শন করিয়া প্রাণে কথঞ্চিৎ আনন্দ লাভ করে ব্রজবালার হৃদয়ও সেই অজ্ঞাত এবং অনাগত সুখালোক সন্দর্শনের প্রয়াস পাইল।↤

ব্রজবাসী তাহাকে কাছে বসাইয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন, কত সান্ত্বনাবাক্য বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ব্রজবালার ভবিষ্যতের চিন্তায় তিনিও চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। ব্রজবাসী, কখন কি হয় ভাবিয়া তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি ব্রজবালার নামে দানপত্র করিয়া ↦ লিখিয়া↤ দিলেন। নলিনাক্ষবাবু পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিবার জন্য আর একজন ডাক্তারকেও সঙ্গে লইলেন। ব্রজবাসী নূতন ডাক্তার দেখিয়া ↦বুঝিতে পারিলেন নলিনাক্ষের এই কার্য। তিনি তাহাকে কহিলেন,↤ "আমি এখন ভালই আছি, আমার জন্য আর আপনাকে কষ্ট করিয়া আসিতে হইবে না।" নলিনাক্ষবাবু ব্রজবাসীর মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ইনি খুব ভাল ডাক্তার, বিনাব্যয়ে লোকের চিকিৎসা করিয়া থাকেন।" ব্রজবাসী আর কোন কথা কহিলেন না। দুই এক দিনের মধ্যে ব্রজবাসীর রোগের উপশম হইয়া জীবনের আশা হইল, ব্রজবালার মুখে আবার একটু হাসি দেখা দিল। কয়েক দিন অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ব্রজবালা ঘুমাইবার সময় পাইত না। আজ ক্ষেমঙ্করী তাহাকে ঘুমাইবার জন্য পুত্রবধূর সঙ্গে জোর করিয়া নিজের বাসায় পাঠাইয়া দিলেন।

ব্রজবাসীর শরীর আজ ভালই আছে; ক্ষেমঙ্করী তাহার নিকট বিছানা করিয়া শুইলেন। ব্রজবাসী কহিলেন, "মা, আমি অনেক দিন হইতে ব্রজবালার স্বামীর অনুসন্ধানে বাহির হইব মনে করিতেছি, কিন্তু কোন সুবিধা করিয়া যাইতে পারি নাই। রাধা-রাণীর কৃপায় এ যাত্রা রক্ষা পাইলে একবার বৃন্দাবনে গিয়া পরে নিশ্চয়ই বাহির হইব, আর কাল বিলম্ব করিলে চলিবে না।" এই

ভাবে ক্রমে ক্ষেমঙ্করীর নিকট ব্রজবালার পূর্বপরিচয় জানাইলে, ক্ষেমঙ্করীও কমলার বিপদের কথা জানাইলেন ; ইহাতে ব্রজবাসীর মনে আশা হইল, ব্রজবালার স্বামীকেও পাওয়া যাইতে পারে। তিনি এবার বৃন্দাবনে গিয়া পরে পূর্ববঙ্গে যাওয়া স্থির করিলেন।

* (ঐতিহ্যবাদ)

কিন্তু প্রাক্ এই অন্ধকারে
ভালোবাসা সন্তুষ্ট
বহুরূপী উপনিবেশ ভেদ
কেউ যে একটি মুক্তি চাবে
তারা কোথাও বিপ্লব। দুর্গাও পাথর পৌঁছোলো
দিগ্বিজয়ী প্রান্তরে চিত্ত
যেমন সুদূরের সংসারের শ্রেণীর
প্রতীকের ও মানুষের কেউ প্রাণে প্রতীকের
মানবতার থেকে ও প্রকাশের
বাঁধা কেই মানব ও প্রকাশের সংসারের
সম্প্রতি প্রাণের যদি।

৮

সময়ের কি আশ্চর্য পরিবর্তন! যে একদিন ঘোর বিপদের মধ্যে পড়িয়াও তাহার ভবিষ্যৎ জীবনকে সুখী করিবার জন্য কল্পনায় সুখের সংসার পাতিয়াছিল, যে নিরাশ্রয় অবস্থায় নদীতটে বালুকা-রাশির মধ্যে বসিয়াও আপনাকে কল্পনা-বলে দাম্পত্য সুখে সুখী ভাবিয়াছিল, চন্দ্রালোকে উদ্ভিন্নমানযৌবনা নববধূর মুখচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিয়াই যে আপনাকে ভবিষ্যতে সৌভাগ্যবান মনে করিয়া আকাঙ্ক্ষায় তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই, আজ সেই রমেশ পরিবর্তিত হইয়াছে। একদিন যে রমেশ তাহার অর্থের দ্বারা প্রিয়জনের চিত্তবিনোদন করিত, একদিন যে রমেশ হেমনলিনীকে উত্তমাঙ্গী কল্পনায় নিজের চির-অভ্যস্ত পল্লীস্বভাবের আচার-ব্যবহার দূরে অপনয়ন করিয়া নাগরিকজনোচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়াও সুখের তৃপ্তি মিটাইতে পারে নাই, আজ সেই রমেশ তাহার বৃদ্ধা ঠাকুরমার সহিত সাধারণ চালচলনে বৃন্দাবনে বাস করিতেছে। এখন তাহাকে দেখিলেই মনের পরিবর্তিত অবস্থার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহাকে কালো ফিতে-পাড় ধুতি কি ডসনের জুতা আজকাল ব্যবহার করিতে দেখা যায় না। সাদা থানের ধুতি, একখানি লংক্লথের চাদর, একটি জামা এবং একজোড়া চটিজুতা পরিধানে তাহার বিলাসিতার সাধ মিটিতেছে। রমেশের আশা ছিল, বৃন্দাবনে ব্রজবালা সুশীলাকে দেখিতে পাইবে, কিন্তু ব্রজবাসীঠাকুর কাশীতে অবস্থিতি করায় তাহার

আশা পূর্ণ হইতেছে না।

↦মানুষের জীবন এমনই সত্যলাভে উৎসুক যে শতমিথ্যার গ্রন্থি ছিন্ন করিয়াও সে আপন যথার্থ পথে স্বভাবতঃ চলিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু সত্যপথে চলা কোনোকালে কাহারো দ্বারা ফাঁকি দিয়া হয় নাই। তপোবল হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ সংসারীর সহ্যগুণটুকুও সাধনালব্ধ। ফাঁকি দ্বারা এ জগতে কেহ বড় হইতে পারে নাই। রমেশ ইতিপূর্বে জমার ঘরে একেবারে শূন্য রাখিয়া খরচের ঘরে অঙ্কপাত করিয়া চলিতেছিল, হঠাৎ যেদিন হিসাবের তলব পড়িল তখন রমেশ দেখিতে পাইল, তাহার জীবনের জমার ঘর শূন্য, খরচের অন্ত নাই। এই নিমিত্তই সে সংগ্রহ করিবার জন্য বৈরাগ্যব্রত অবলম্বন করিয়াছিল। এই ব্রত সাঙ্গ হইবার পূর্বে সে অপর কোনো কার্যকে জীবনে বহন করিতে রাজী ছিল না।↤

হরসুন্দরী তাহাকে ওকালতি করিবার জন্য কখনো কখনো বলিতেন; কিন্তু রমেশ তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিত না। রমেশ এখন যে ঘরে শুইয়া থাকে, তাহা আর পূর্বের ন্যায় সুসজ্জিত রাখে না, একটা টেবিল, একখানা চেয়ার, খানকতক ধর্মপুস্তক, দুই একখানা ছবি, ইত্যাদি কয়েকটি মোটামুটি জিনিষ তাহাতে ছিল।

বৃদ্ধা ঠাকুরমা যখন ধূপ, দীপ, ফুলচন্দনে ঘরের মধ্যে বসিয়া ভগবানের অর্চনা করিতেন, রমেশ তখন তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া মনে অতুলনীয় আনন্দ অনুভব করিত। ধূপ, চন্দন ও ফুলের গন্ধে পিতামহীর উপাসনাগৃহে তাহার মনে যে ↦তৃপ্তির উদয় হইত,↤ বিলাতি গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি তৈল বা↦বিলাস-সামগ্রী↤ অপেক্ষা তাহার মূল্য অনেক বেশী ইহা এখন সে বুঝিতে পারিল।

রমেশ প্রাতঃকালে শয্যাবাস পরিত্যাগ করিয়া ↦ সর্বাগ্রে↤ ঠাকুরমার পূজার ফুল-তুলসী তুলিয়া দিয়া পরে কোন কোন দিন

রাধারাণী দর্শন করিতে যাইত, কোন দিন বা ↦যমুনাতীরে↤ ভ্রমণে ↦বাহির হইত।↤ কোথাও নাম-সংকীর্তন বা হরিসভা হইলে রমেশ ঠাকুরমাকে সঙ্গে ↦করিয়া↤ লইয়া যাইত।

প্রথম প্রথম হরসুন্দরী রমেশের আহারের ব্যবস্থা আগেই করিয়া দিতেন, কিন্তু রমেশ ক্রমে তাহাতে আপত্তি জানাইয়া ঠাকুরমার আহারের পর নিজে আহার করিত। রমেশকে অনেক সময় এই সব অসুবিধার কথা জানাইয়া বৃদ্ধা ঠাকুরমা বধূকে এখানে আনিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রমেশ একদিন মনে করিল ঠাকুরমার নিকট রহস্য প্রকাশ করিবে। কিন্তু তাহা হইলে তিনি পুনরায় বিবাহ করিবার জন্য খুব ব্যতিব্যস্ত করিবেন ভাবিয়া সে তাহা বলিতে পারিল না।

হরসুন্দরী একদিন বলিলেন, "রমেশ! আমি সুশীলাকে লইয়া দু'দিন ঘর করিতে পারিলাম না। আজ বাদ কাল মরিয়া যাইব; তুমি তাহাকে কাশী হইতে এখানে লইয়া আইস। এখন ত আমরা নিকটেই আসিলাম, কল্যই তাহাকে আনিতে যাও। তোমার ↦অসুবিধা↤ আমি আর দেখিতে পারি না। এখন সুশীলা আমার নিকটে থাকিয়া ঘরকন্না করিতে না শিখিলে আর কবে শিখিবে? তুমি যে নিজে নিজে বিছানা বিছাও, পান সাজিয়া খাও, ইহা দেখিয়া আমার মনে বড় আঘাত লাগে; তুমি কাশীতে চিঠি লিখিয়া দাও। এই মাসেই তাহাকে আনিতে হইবে।"

রমেশ ঠাকুরমার কথায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইল। একবার মনে করিল সব বিষয় খুলিয়া বলে। কিন্তু ↦ তৎক্ষণাৎ সঙ্কোচ আসিয়া সে পথ বন্ধ করিয়া দিল।↤ রমেশ তখনকার মত ঠাকুরমার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কহিল, "সুশীলার পত্র পাইয়াছি। সে আজ কয়েকদিন হইল, কাশী হইতে তাহার মামার বাড়ী গিয়াছে। ফাল্গুন মাসের প্রথমে তাহার মামারা এখানে রাখিয়া

মানুষের জীবন এমনই সত্য যাহা
উপেক্ষা করিয়া অন্তর্যামীর দৃষ্টি দিয়া
করিয়াও সে তাহার যথার্থ মূল্য বুঝাইতে:
তাঁহাতে চেষ্টা করিয়া থাকো। কিন্তু
সত্যপথ জানা কোনোকালে তাঁহাকে
ছাড়া ফাঁকি দিয়া হয় নাই।
জীবনের হইতে অবসৃত করিয়া সাহিত্যের
সংসারীর সত্যের দুঃখও সাহিত্যলক্ষ্মী।
ফাঁকি তাঁহার একান্ত কেহ হইতে পারে নাই।
একদা ইতিহাসে জমার ঘরে একেবারে
শূন্য রাখিয়া খরচের ঘরে অঙ্কপাত
করিয়া চলিতেছিল তাহার জীবন হিসাবে
তখন আমি জীবন [illegible] কাহাকে আপন, তাহার
জীবনের জমার ঘর শূন্য — খরচের অন্ত নাই।
এই বন্দীশিল্পী যে সংসার কাহার [illegible]
[illegible] অবলম্বন করিয়াছিল। এই বৃত্তান্ত
হইতে [illegible] যে তাহার কোনো [illegible]
[illegible] কাহারও [illegible] দিল না।

যাইবেন, লিখিয়াছে।” রমেশ ভাবিল, আপাতত ত কিছুদিনের জন্য অবকাশ পাইলাম। হরসুন্দরী কহিলেন, “এখনকার বৌদের তপস্যা ভাল, স্বামী তাহাদের আজ্ঞাবহ। আমাদের সময়ে একদিনও বাপের বাড়ীতে থাকিতে দিতেন না। সংসারের কাজ করিতে করিতে প্রাণ বাহির হইয়া যাইত। এখনকার বৌদের খাটুনি নাই বলিলেই হয়। ↦কাজের মধ্যে↤ বই পড়া আর চিঠি লেখাই ↦সর্বপ্রধান।↤ দুটো পান তৈয়ারী করিতে গেলেই হাতে সাবানের দরকার হয়। তোমার ভয় নাই রমেশ। তুমি সুশীলাকে এখানে আনিলে আমি তাহাকে কোনরকম অসুবিধা ভোগ করিতে দিব না। আমার কত দুঃখের নাতবৌ, তাকে কি আমি কষ্ট দিতে পারি ?”

↦রমেশ মনে করিল, ঠাকুরমা দেখি আবার উল্‌টা আমার ঘাড়ে দোষারোপ করিতেছেন। এক মিথ্যাকে ঢাকিতে গিয়া শতমিথ্যার অপরাধ তাহাকে যেন ঘিরিয়া দাঁড়াইল।↤ সে একটু হাসিয়া কহিল, “ঠাকুমা, আপনি দেখিতেছি নাতবৌ নাতবৌ করিয়া পাগল হইয়া যাইবেন। আমি আজই পত্র লিখিতেছি, ফাল্গুনের প্রথমেই তাহাকে এখানে আনিব।”

রমেশ হরসুন্দরীকে কয়েকদিনের জন্য নিবৃত্ত করিল বটে, কিন্তু ঐ কয়দিনের মেয়াদ ফুরাইলে কোন্ সুশীলাকে ঘরে আনিবে সে তাহাই চিন্তা করিতে লাগিল। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, চিন্তারও শেষ নাই এবং কৌশলেরও অন্ত নাই।

যেমন মনে হইল তাহারা দেখি
আবার উল্টা আমার ঘাড়ে দোষারোপ
করিতেছেন। এবং ঈশ্বরকে ডাকিতে
যাহা করিয়াছে সকলে তাহাকে দেখে
দাঁড়াইয়া দাঁড়াইলো।

৯

বলদেব ব্রজবাসী আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। কাশীতে সহসা →জ্বরের প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়ায়← তিনি ব্রজবালার স্বামীর অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। বৃন্দাবনে হরসুন্দরী আছেন জানিয়া তাঁহার নিকটেই ব্রজবালাকে কিছুদিনের জন্য রাখিয়া যাওয়া স্থির করিলেন।

অনন্তর তিনি বৃন্দাবনে গমন করিয়া হরসুন্দরীকে কহিলেন, "মা! আমি একবার পূর্ব্ববঙ্গে যাইব। আজ কাল, যাইব যাইতেছি, করিয়া আর কালবিলম্ব করা আমার উচিত হইতেছে না। সে দিন কাশীতে যে জ্বর হইয়াছিল, তাহাতে আমার মৃত্যু হইলে ব্রজবালার কোন উপায় করিয়া যাইতে পারিতাম না। ব্রজবালার একটি উপায় করিতে না পারিলে আমার মনে শান্তি পাইতেছি না। রাধারাণীর কৃপায় তাহার স্বামীর অনুসন্ধান পাইলে তাহাকেও এখানে আনিয়া নিকটে রাখিব ইচ্ছা আছে। কে যেন আমার মনকে বলিতেছে, শীঘ্রই ব্রজবালার স্বামীর অনুসন্ধান পাওয়া যাইবে। কাশীতে যেখানে আমি বাসা করিয়াছিলাম তাহার নিকটে নলিনাক্ষবাবু নামে একজন ডাক্তার আছেন। তাঁহার মাতা ক্ষেমঙ্করীর মুখে একদিন শুনিলাম নলিনাক্ষবাবুর নাকি বিবাহের পরই বৌ হারাইয়াছিল এবং প্রায় এক বৎসর পরে সেই বৌ পাইয়াছিলেন। এই ঘটনা শুনিয়া আমার মনে ধারণা হইয়াছে, নিশ্চয়ই আমার ব্রজবালা তাহার হারান

পতিকে পাইবে। আমি সেদিন রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলাম, ব্রজবালার স্বামী নিজেই আমাদের বাড়ী আসিয়াছেন।"

হরসুন্দরী ব্রজবাসীকে কহিলেন, "ভগবান আপনার স্বপ্ন সত্য করুন। আপনার কোন চিন্তা নাই; ব্রজবালাকে আমি কন্যার মত স্নেহ করি। আপনি যে কয়দিন না আসেন সে আমার নিকটেই থাকিবে। ব্রজবালা যে লক্ষ্মী মেয়ে, তাহার হাতের ভাত খাইতেও আমার আপত্তি নাই।

"আমার রমেশ এই মাস পরেই তাহার বৌকে এখানে আনিবে। নাতবৌ আসিলে ব্রজবালার রামায়ণ-মহাভারত পড়ার সঙ্গিনী হইবে। আমার রমেশ সোনার ছেলে, তার মুখে একটি বড় কথা শুনিতে পাইবেন না। সে পথে হাঁটিতে হইলে কাহারও প্রতি মুখ তুলিয়া চায় না। আপনার কোন ভাবনা নাই। আপনি পূর্বদেশে গেলে ব্রজবালা আমার কাছে বেশ সুখে থাকিবে।"

রমেশ নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিল। এই কথোপকথন শুনিয়া সে একটু মনে মনে শান্তি পাইল। মিলন ক্রমে নিকটবর্তী হইয়া আসিতেছে, ইহা রমেশ বেশ বুঝিতে পারিল।

ব্রজবাসী হরসুন্দরীকে কহিলেন, "মা, রমেশ যে ভাল ছেলে, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি বিশেষভাবে শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁর মত লোককে অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। আপনাদের কাছে ব্রজবালার কোন অসুবিধা হইবে না, ইহা আমি জানি। ব্রজবালা আমাকে যেমন ভক্তি করে, আপনারও প্রতি তাহার সেইরূপ ভক্তি আছে। আপনার কাছে সে ভালই থাকিবে। আমি কল্যই বাড়ী হইতে রওনা হইব।"

ব্রজবালা এই সময়ে অন্য ঘরে কার্যে ব্যাপৃত ছিল; ব্রজবাসী তাহাকে নিকটে ডাকিলেন।

ব্রজবালা পিতার নিকট আসিতে আসিতে একটা বাধা পাইয়া

দাঁড়াইয়া রহিল। জীবনে এমন সুখের বাধা সে আর কখনও অনুভব করে নাই।

ব্রজবাসী ব্রজবালাকে সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইতে দেখিয়া কহিলেন, "মা, তুমি এখানে এস, কোন লোক নাই। রমেশ আমাদের ঘরের ছেলে, তুমি তাঁর সঙ্গে কথা বলিলেও দোষ নাই।"

পিতার অভয়বাক্য সত্ত্বেও ব্রজবালা লজ্জা দূর করিতে পারিল না। সে মাথার কাপড় টানিয়া ঘোমটা দিয়া পিতার নিকট লজ্জাবতীলতার মত সঙ্কুচিতভাবে দাঁড়াইলে তিনি কহিলেন, "মা, আমি কল্য একবার যাত্রী সংগ্রহ করিতে যাইব। তুমি এখানে ইহাদের নিকট থাকিও। কোন চিন্তা করিবে না, সত্বরই ফিরিয়া আসিব।"

১০

রমেশের পিতা ব্রজমোহনের বাল্যাবস্থাতেই হরসুন্দরী বিধবা হইয়াছিলেন। নাবালক পুত্রের জন্য তিনি অন্যান্য বিধবার মত শুচিবায়ুগ্রস্ত হইতে পারেন নাই। বৃন্দাবনে ব্রজবালাকে পাইয়া তাঁহার অনেক অভাব দূর হইল। ব্রজবালাই রান্না করিতে আরম্ভ করিল, বৃদ্ধা তাহার হাতে খাইতে কোন আপত্তি দেখাইলেন না।

রমেশ যখন বেড়াইতে বাহির হইত ব্রজবালা সেই অবকাশে রমেশের জন্য পান তৈয়ার করিয়া রাখিয়া আসিত। তাহার রৌদ্রে-দেওয়া কাপড় কোঁচাইয়া আলনায় রাখিয়া দিত, কোন দিন বা বৃদ্ধার পূজার ফুল লইয়া মালা গাঁথিয়া রমেশের ফটোর গলায় পরাইয়া দিত।

ব্রজবাসী কেন পূর্বদেশে গেলেন, ব্রজবালা ইহার প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিল না। ব্রজবাসী রমেশের সম্মুখে যখন ব্রজবালাকে ডাকিয়াছিলেন, তখন ব্রজবালা মনে করিয়াছিল, বুঝি পিতা তাহার পরিচয় রমেশকে জানাইয়াই তাহাকে ডাকিতেছেন; কিন্তু নিকটে গিয়া সে ভাবের কোন আভাস জানিতে পারে নাই। ব্রজবালা মনে করিত রমেশ নিশ্চয়ই তাহাকে জানিতে এবং বুঝিতে পারিয়াছেন, সেই জন্য সে একটু সঙ্কুচিতা হইয়াই সর্বসময়ে চলা-ফেরা করিত। কিন্তু পতিসেবার যাহাতে ত্রুটি না হয় তৎপ্রতি খুব লক্ষ রাখিত।

কমলা নলিনাক্ষকে যে ভাবে ভক্তি করিত, সুশীলার তাহা স্মরণ হইতে লাগিল; কিন্তু প্রকাশ্যভাবে কিছু দেখাইতে পারিত না। ব্রজবালা তাহার এক নূতন প্রতিবেশিনীর নিকটে ➡পশমের⬅ হার গাঁথিতে শিখিয়া একগাছা হার নিজে প্রস্তুত করিল। একদিন মনে মনে স্থির করিল, রমেশের গলায় এই হার পরাইয়া দিবে। কিন্তু রমেশ যদি তাহার পরিচয় না পাইয়া থাকে তবে তিনি কি মনে করিবেন ভাবিয়া তাহা পারিল না। এক একবার মনে করিত, 'আমি যখন ঠিক বুঝিতে পারিতেছি ইনিই আমার স্বামী, তখন আমি আমার পরিচয় নিজে দিলেই বা দোষ কি?' কিন্তু স্ত্রীজাতির স্বভাবসুলভ লজ্জার জন্য তাহা পারিত না। অনন্যোপায় হইয়া সেই হার রমেশের ফটোতে পরাইয়া ব্রজবালা ফিরিয়া আসিতেই সম্মুখে রমেশকে দেখিতে পাইল। রমেশ সহসা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ব্রজবালা অবগুণ্ঠিতাবস্থায় লজ্জায় কোণে দাঁড়াইয়া আছে।

রমেশ মনে করিল একবার সুশীলা বলিয়া ডাকে। কিন্তু সুশীলা তাহাকে চিনিতে পারিয়াছে কিনা সন্দেহে, বিশেষতঃ যদি না জানিয়া থাকে তবে হয়তো ঠাকুরমার কানেও এই কথা পৌঁছিতে পারে, ভাবিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

➡অথচ সুশীলাকে রমেশ চিনিতে পারিয়াছে এবং রমেশকে সুশীলা চিনিয়াছে, কিন্তু তাহাদের পরস্পরের বাক্য বাহির না হওয়া পর্যন্ত এ সন্দেহের ভঞ্জন নাই। এ ঠিক যেন খাঁচার পাখী ও বনের পাখীতে আলাপ। উভয়েই পাখী অথচ তাহাদের মধ্যে বাধা রহিয়াছে খাঁচার কাষ্ঠ-আবরণ। সুশীলা বুঝিয়াছে যে তাহার বনের পাখী রমেশ এইবার খাঁচার ফাঁক দিয়া ঠোঁট প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে, এবং রমেশও বুঝিয়াছিল যে তাহার খাঁচার পাখী সুশীলা এবার তাহার ডাকে সাড়া দিয়াছে, কিন্তু তথাপি ঐ খাঁচার আবরণের ন্যায় তাহাদের সন্দেহের বাধা আর কাটিতে চাহিতেছিল না।⬅

অথচ সুশীলাকে সুরেশ চিনিতে পারিয়াছে
এবং সুরেশকে সুশীলা চিনিয়াছে
কিন্তু তাহাদের পরস্পরে তাহা প্রকাশ
না হওয়া পর্যন্ত এ সম্বন্ধে জানা নাই।
এ ছবিতে যে খাঁচার পাখী ও বনের পাখীতে
আলাপ। উভয়েই পাখী অথচ তাহাদের
মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ রহিয়াছে
খাঁচার। সুশীলা বুঝিয়াছে যে
তাহার বনের পাখী সুরেশ এইবার খাঁচার
পাখী হইল তাহার প্রবেশ করিল
খাঁচাতে এবং সুরেশ বুঝিয়াছিল যে
তাহার খাঁচার পাখী সুশীলা একদিন
বাহির ভাবে সাড়া দিয়াছে কিন্তু তখনই
ঐ খাঁচার আকর্ষণে পুনঃ তাহাদের
সম্বন্ধের কথা বাহির করিতে পারিতেছিল
না।

রমেশ না বুঝিয়া হেমনলিনী ও কমলাকে ভালবাসিয়াছিল। এখন আবার ব্রজবালাকে প্রণয়দৃষ্টিতে দেখিলে পুনরায় একটি দুঃখ টানিয়া আনা হইবে মনে করিয়া সে ব্রজবালাকে কোন কথা বলিতে পারিল না। ব্রজবালা ↦ সঙ্কুচিত হইয়া ↤ কোণে দাঁড়াইয়া নিজেকে অত্যন্ত বিপন্ন মনে করিতে লাগিল। একবার ভাবিল গলায় কাপড় দিয়া একটা প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করে, "আপনার ঠাকুরমার নিকটে যে সুশীলার কথা শুনিতে পাইয়াছি, আপনি তাহাকে পাইয়াছিলেন?" কিন্তু সাহসে কুলাইল না।

রমেশ বাহির হইয়া গেলে ব্রজবালা ↦তাড়াতাড়ি ↤ কার্যান্তরে গমন করিল। অন্যান্য দিন ব্রজবালা রমেশের সম্মুখে বাহির হইয়া ভাত খাইতে দিত, আজ আর তাহা পারিল না। ঠাকুরমার উপর ব্রজবালা ভাত দিবার ভার দিয়া অন্য কার্য করিতে লাগিল।

রমেশ এক একবার মনে করে ঠাকুরমার কাছে সব বিষয় খুলিয়া বলিবে, কিন্তু তাহা বলিতে পারে না। ব্রজবাসী ফিরিয়া না আসিলে রমেশ কোন বিষয় প্রকাশ করিতে সাহসী হইল না।

১১

↦মানুষের মন সাধারণতঃ দুইটি পথ অনুসরণ করিয়া চলে। একটি নিবৃত্তির পথ, অন্যটি বাসনালালসাময় প্রবৃত্তির পথ। কোন্ পথের যাত্রী যে সত্যভাবে ঈশ্বরের দ্বারদেশে উপনীত হয়েন তাহা অদ্যাপি কেহ জোর করিয়া বলিতে পারেন নাই। বুদ্ধদেবের নিবৃত্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ অথবা সংসারীর প্রবৃত্তিপথ যথার্থ, তাহা কে বলিতে পারে? কিন্তু যে ব্যক্তি গম্যস্থানের প্রতি দৃষ্টি রাখে, সে উক্ত পথদ্বয়ের যে কোনোটি অনুসরণ করুক না কেন, পরিশেষে শ্রীভগবানের চরণতলে আসিয়া ঠেকিবেই। হেমনলিনীর প্রেমের অভিযান এতদিন দ্বিতীয় পথ বাহিয়া চলিয়াছিল; কিন্তু হঠাৎ নলিনাক্ষের আবির্ভাবে সে নিবৃত্তিমার্গে আপনার প্রেমাভিষেককে নিয়ন্ত্রিত করিল। বাহিরের সাজসজ্জার বিলাসকে এবং রমেশের মনোরঞ্জন করিবার বিচিত্র উপায়কে↤ ↦সে দূরে পরিহার করিয়া শুচি হইয়া আপনার হৃদয়মন্দিরে সেই শ্রেষ্ঠ প্রেমিকের শ্রেষ্ঠ প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের নিমিত্ত পূজানিরতা হইয়াছিল। মানুষের অসম্পূর্ণ প্রেমমার্গে যাইতে যাইতে হেমনলিনী যে অনন্তপথের অমৃত-পথের যাত্রী হইল তাহা সকলের সৌভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। সে খুঁজিতে যাইতেছিল কাঁচখণ্ড; লাভ করিল অপ্রত্যাশিত অত্যুজ্জ্বল হীরকখণ্ড। হেমনলিনী সত্যই স্বীয় সাধনাপ্রভাবে অন্তরে একটি তেজঃ সঞ্চয়↤ ↦করিয়াছে। সেই তেজঃপ্রভাবে সে আজ মানবপ্রেমকে, ঐশ্বর্যের জ্যোতিকেও তুচ্ছ করিতে পারে। রমেশের

প্রতি তাহার ব্যবহার সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেছে ; সে রমেশকে পূর্বের ন্যায় আর প্রণয়দৃষ্টি দ্বারা না দেখিয়া মানবগৌরবের চরম সম্মানমণ্ডিত একটি প্রসন্ন অথচ নির্লাজ দৃষ্টি দ্বারা বারংবার অভিবাদন করিয়াছে। সে এই পৃথিবীতে আসিয়া যে বরের গলায় মাল্য দান করিয়াছে সে বর চিরপ্রাচীন অথচ চিরনবীন ; সেই শ্রেষ্ঠকেই অন্বেষণ করিবার নিমিত্ত বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, মহম্মদ গুহায় বাস করিয়াছিলেন এবং মহাত্মা খৃষ্ট প্রতিদিন অসহ্যযন্ত্রণা বহন করিয়া পরিশেষে প্রাণপাত করিয়াছিলেন! এমন পতিকে হেমনলিনীর ভাগ্য হইতে↤ ↦হরণ করিয়া লইবার ক্ষমতা কোনো মানবের নাই। যে তাঁহাকে একবার পতিরূপে বরণ করিয়াছে তিনি তাহার পাশে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং আজ হেমনলিনীর পার্শ্বেও তাঁহার স্থান হইয়াছে। ধন্য, হেমনলিনী ধন্য! অন্নদাবাবুর হৃদয়ের অপর্যাপ্ত স্নেহ এবং শুভ ইচ্ছা সে প্রতিদিন সেই দেবতার নিকট পুষ্পের ন্যায় নিবেদন করিয়া দিত। অন্নদাবাবু কেবল মনে করিতেন, "তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী।"↤

অন্নদাবাবু বসন্তের প্রারম্ভেই স্বাস্থ্যের উন্নতি-কামনায় এবার বৃন্দাবন পর্যন্ত আসিয়াছেন। হেমনলিনী পিতার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারে না। সে পিতা-মাতা উভয়েরই স্নেহ ↦অন্নদাবাবুর↤ নিকট ↦হইতে↤ পাইয়া আসিতেছে। বৃন্দাবনে রমেশের সাক্ষাৎ পাইবেন ইহা তাঁহারা জানিতেন না।

একদিন সহসা পার্শ্বের বাড়ীতে রমেশকে দেখিতে পাইয়া অন্নদাবাবু তাহাকে ডাকিলেন। হেমনলিনী পিতার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া ছিল। রমেশ আসিয়া উপস্থিত হইলে অন্নদাবাবুর সহিত তাহার নানারূপ কথাবার্তা হইল।

অনন্তর রমেশ সেই দিনকার মত বিদায় গ্রহণ করিয়া যাইবার জন্য উত্থিত হইলে হেমনলিনী বিনীতভাবে রমেশকে

মানুষের মন স্বভাবত: দুইটি পথ-
অনুসরণ করিয়া চলে। একটি নিবৃত্তির
পথ, অন্যটি বাসনা-লালসাময়
ও প্রবৃত্তির পথ। কোন পথের যাত্রী-
যে সত্যভাবে ঈশ্বরের দ্বারদেশে
উপনীত হয়েন, তাহা অনুসন্ধেয়—
কেহ কহিয়া বলিতে পারেন নাই বুদ্ধদেবের
নিবৃত্তিমার্গ শ্রেষ্ঠ অথবা সংসারীর
প্রবৃত্তিপথ যথার্থ, তাহা কে বলিতে পারে?
~~[illegible]~~ কিন্তু যে প্রীতি পথ/সম্বন্ধে
শ্রীচৈতন্যদেব যে উক্ত পথদ্বয়ে-
র কোনোটি অনুসরণ করেন নাই কেন
পরিশেষে শ্রীভগবানের চরণতলে আসিয়া ঠেকিয়াছে।
প্রেমলীলায় প্রেমের অভিসার ~~[illegible]~~
~~প্রথমে~~ দ্বিতীয় পথ ধরিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু
তাহা লীলাময়ের অভিসারে যে নিবৃত্তিমার্গে
আবার প্রেমপ্রতিবন্ধককে নিয়ন্ত্রিত করিল।
বাহিরের সাধনার ভিতরে যে এক
রসের মাধুর্যের আস্বাদ বিচিত্র উপায়কে

সে দিকে ধাবিত হয় কবিতা
শুচি হইয়া আমাদের হৃদয় মন্দিরে
সেই শ্রেষ্ঠ প্রেমীকের শ্রেষ্ঠ প্রেমাস্পদ
শ্রীভগবানের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।
মানুষের অসংখ্য প্রেমমার্গে যাইতে
যাইতে প্রেমাকাঙ্ক্ষী যে মনুষ্যদের
অন্তর মধ্যে যাত্রী হইল তাহার সকলের সৌভাগ্য
যাহার উচিত না। সে খুঁজিতে যাইতেছিল
কাঁচা বস্তু লাভ করিল অপ্রত্যাশিত
অমূল্য হীরকখণ্ড। এ প্রেমাকাঙ্ক্ষী মানুষই
শ্রীর সাধনাপ্রভাবে অন্তরে একটি তেজঃ সঞ্চার

করিয়াছে। সেই জন্য ভাবে সে
আজ মানবপ্রেমকে, ঐশ্বর্য্যের আভিজাত্য
মুক্ত করিতে পারে। ধনের প্রতি
লোভ তাহার সম্পূর্ণ পরাভূত হইয়া
গেছে; সে ~~ধন~~ ধনকে পূর্ণরূপে
আর প্রবৃত্তির দ্বারা ~~[illegible]~~ না
দেখিয়া মানবগৌরবের প্রেমসমুদ্র-
~~[illegible]~~ মন্থিত একটি অমৃত সম্ভব
নির্মল দৃষ্টি দ্বারা ~~[illegible]~~
তাহার অভিনন্দন করিয়াছে।
সে ~~[illegible]~~ এই পৃথিবীতে
~~[illegible]~~ আসিয়া যে ধনের
সাধনায় মানুষ ধন্য করিয়াছে
সে ধন ~~[illegible]~~ চিরপ্রাচীন অথচ
চিরনবীন; সেই শ্রেষ্ঠধন
-ধর্ম * অর্জন করিবার
নিমিত্ত বুদ্ধদেব সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন
সমস্ত উহাই ফেলিয়া দিলেন এবং
মহাত্মা যীশু পৃথিবীর সমস্ত ধনকে
তুচ্ছ করিয়া আপনাকে প্রাপ্তরূপে
সাজাইয়াছিলেন। এখন ভক্তিতে
~~[illegible]~~ প্রেমাঞ্জলি দিতে হইবে

এর কারণ পৃথিবীতে অমন কোন মানুষ
নাই। যে তাঁহাকে একবার দেখিয়াছে
সেই জানিয়াছে তিনি কেমন ভালো
ভক্তবৃন্দ সকলের এবং সব প্রেমশালিনীর
সাধারণ তাঁহার স্বভাব হইয়াছে।
কিন্তু, প্রেমশালিনী হয়। [illegible] অমূল্যবাবু
হইলে অসহায় স্নেহ এবং স্তুতিবাদ
ও সে তাঁহার সেই প্রেমের ভাব
দুঃখের সঙ্গে নিজের কাছে গেল।
অমূল্যবাবু বলিলেন মানুষ তাহাকে, "তোমার
নিজের ইচ্ছায় অসংখ্য স্বামী।"

নমস্কার করিয়া কহিল, "রমেশবাবু, ক্ষমা করিবেন। আমার অন্যায় ব্যবহারের জন্য কিছু মনে করিবেন না, আপনার চরণে ইহাই প্রার্থনা। আপনার দেখা না পাইলে আমার মনে একটি অশান্তি এ জীবনে থাকিয়া যাইত।"

রমেশও প্রতিনমস্কার করিয়া কহিলেন, "আপনিও কিছু মনে করিবেন না।"

কাশীতে রমেশকে দেখিয়া অন্নদাবাবুর মনে যে একটু অশ্রদ্ধার ভাব হইয়াছিল এখন তাঁহার মনের সে ভাব নাই। তিনি সময়-মত রমেশের বাসায় আসিয়া, কখনও বা নিজের বাসায় তাহাকে লইয়া গিয়া, ধর্ম আলোচনা করিতেন। রমেশ ও অন্নদাবাবু দুজনে সকালে বিকালে বেড়াইতে বেড়াইতে ধর্ম আলোচনায় বেশ তৃপ্তি লাভ করিতেন।

ব্রজবালা হেমনলিনীকে তাহাদের বাড়ীতে লইয়া গিয়া গীতা ও ভাগবত পড়িতে দিত। হরসুন্দরী দুপুর বেলায় হেমনলিনীর নিকটে ভাগবত শুনিতেন। ক্রমে তাঁহার হেমনলিনার প্রতি বেশ স্নেহ জন্মিল। হরসুন্দরীর আহার হইয়া গেলেই ব্রজবালা হেম-নলিনীকে বাড়ী লইয়া যাইত।

একদিন বৃদ্ধা কহিলেন, "ফাল্গুন মাসের প্রথমেই সুশীলাকে এখানে আনিব। সে আসিলে তোমরা তিন জনে বেশ আমোদ-আহ্লাদ করিতে পারিবে। হেমনলিনী, তুমি বাছা আমার সুশীলাকে একটু উলের কার্য শিখাইয়া দিও।"

হেমনলিনী আনন্দের সহিত বলিল, "রমেশবাবু কি সুশীলাকে পাইয়াছেন? কোথায় কি ভাবে পাইলেন?"

হরসুন্দরী কহিলেন, "সে কি কথা বাছা? সুশীলা যে রমেশের স্ত্রী। তাহাকে আবার কিভাবে কোথায় পাইতে হইবে কেন?"

হেমনলিনী কহিল, "বিবাহের পর যখন রমেশবাবু বাড়ী আসিতেছিলেন, তখন পথিমধ্যে 'নৌকাডুবি'তে সুশীলাকে

হারাইয়াছিলেন তাহাই শুনিয়াছিলাম। তিনি কি সম্প্রতি পুনরায় বিবাহ করিয়াছেন ? না সেই সুশীলাকেই পাইয়াছেন ?”

বৃদ্ধার মনে খট্‌কা বাধিয়া গেল। তিনি কহিলেন, “তুমি কোন্ রমেশের কথা বলিতেছ ? আমাদের রমেশ ত বিবাহের পর সুশীলাকে সঙ্গে লইয়াই বাড়ী আসিয়াছিল !”

হরসুন্দরী যে ইহার গূঢ় রহস্য জানিতেন না, হেমনলিনীও তাহা জানিত না। সে কথায় কথায় সমস্ত ঘটনা বৃদ্ধাকে জানাইয়া দিল।

ব্রজবালার মনের অন্ধকার দূর হইল। তাহার বিশ্বাস ছিল, রমেশের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইয়াছে। কিন্তু আজ তাহার সে সন্দেহ দূর হইল। রমেশ যে তাহারই আরাধ্য পতি এই কথাটা সুশীলা এইবার নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে বারংবার মনে মনে আবৃত্তি করিয়া লইল। বিপদের সময় জপমন্ত্র জপ করিতে করিতে যেমন মানব দ্বিধাশূন্য হয় তদ্রূপ রমেশ যে তাহারি এই কথাটাকে সুশীলা মন্ত্রের মত জপ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল।

রমেশ সন্ধ্যার পর বাসায় আসিলে হরসুন্দরী বলিলেন, “বাছা রমেশ ! তুমি এতদিন আমাকে মিথ্যা কথা বলিয়া গোপন করিতেছ কেন ? তুমি সে দিন বলিলে, ফাল্গুন মাসের প্রথমেই সুশীলাকে আনিবে। আমি ত আজ হেমনলিনীর মুখে শুনিলাম, তুমি যাহাকে বিবাহের পর বাড়ী আনিয়াছিলে তার নাম সুশীলা নহে, কমলা। সে এখন কাশীতে তাহার স্বামীর নিকট আছে।”

রমেশের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ঠাকুরমাকে এখন কি বলিবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

রমেশ কহিল, “আপনি কোন্ রমেশের কথা শুনিয়াছেন ? এক নামে কি দুজন লোক থাকিতে পারে না ? আপনি ব্যস্ত হইবেন না। ফাল্গুন মাসের প্রথমে যদি নাতবৌ না পান, তখন বলিবেন।”

রমেশ বাল্যকালে মাতৃহীন হওয়ায় হরসুন্দরী তাহাকে লালন-পালন করিয়াছেন। রমেশের কথায় বৃদ্ধা কখনও অবিশ্বাস করিতেন না।

বৃদ্ধা ও রমেশ যখন কথা বলিতেছিলেন, তখন ব্রজবালা দীপালোকে বসিয়া পান তৈয়ারী করিতে করিতে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছিল। রমেশ খুব সাহসের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করিল কিন্তু কিছু বলিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিল।

১২

ক্ষেমঙ্করী একদিন পুত্র ও পুত্রবধূকে বলিলেন, "আমি সেদিন রাত্রিতে ব্রজবাসীর মুখে ব্রজবালার যেরূপ পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে আমার বোধ হয় ব্রজবালা তোমাদের সেই রমেশের স্ত্রী।"

কথাটি কমলার মনে স্থান পাইল, কারণ ব্রজবালা একদিন বলিয়াছিল, তাহার প্রকৃত নাম 'সুশীলা'। তখন কেন সমস্ত বিষয় ভাল করিয়া শুনে নাই, এইজন্য কমলার মনে আক্ষেপ হইল।

রমেশ কোথায় আছেন জানিবার জন্য কমলা নলিনাক্ষবাবুকে খুড়োমশায়ের নিকট পত্র লিখিতে অনুরোধ করিল। নলিনাক্ষবাবু কিন্তু একখানি পোষ্টকার্ড খরচ বাঁচিয়া গেলেন, চক্রবর্তীখুড়ো সেইদিন কাশীতে উপস্থিত হইলেন।

নলিনাক্ষবাবু চক্রবর্তীখুড়োকে কহিলেন, "আপনি সেই রমেশবাবুর অনুসন্ধান রাখেন কি ?"

চক্রবর্তীখুড়ো বলিলেন, "আমি আজ ২।৩ দিন হইল বৃন্দাবনে গিয়াছিলাম। রমেশবাবুকে সেখানেই দেখিয়াছি। তিনি বৃদ্ধা পিতামহী সহ বলদেব ব্রজবাসীর বাড়ীতে আছেন। অন্নদাবাবু এবং হেমনলিনীকেও সেখানে দেখিলাম। তাঁহারা পাশাপাশি বাড়ীতে বাস করিতেছেন। রমেশবাবুর কথা সহসা তোমাদের মনে হইল কেন বল দেখি ?"

আমার [illegible] [illegible] আর একটি
হইল। সে কাল এতদিন [illegible]
[illegible] [illegible] ছিল আর সেই কাল
প্রসারিত হইল। [illegible] [illegible] [illegible],
~~[illegible]~~ সেই প্রভাত আলোর মত ~~[illegible]~~
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] হইয়াছিল
[illegible] যে সত্য সে কথা আমার
[illegible] [illegible] [illegible] অনুভব করিলাম।
[illegible] [illegible] ~~[illegible]~~ [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] এক [illegible] [illegible]
~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~। ~~[illegible]~~ যে [illegible]
মধ্যে আমি [illegible] [illegible] যাত্রী
[illegible] [illegible] ঐ [illegible] ~~[illegible]~~[illegible]
~~[illegible]~~ [illegible] [illegible] অতীত [illegible] - [illegible]
আমার [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible] সত্য [illegible] [illegible]।

নলিনাক্ষবাবু হাসিয়া কহিলেন, "ভগবানের কি বিচিত্র লীলা-খেলা! সেই ব্রজবাসীর ব্রজবালা নাম্নী যে একটি পালিতা কন্যা আছেন, তিনিই রমেশবাবুর স্ত্রী সুশীলা। ব্রজবাসী কিছুদিন আগে এখানে আসিয়াছিলেন।"

চক্রবর্তীখুড়ো কহিলেন, "বল কি বাপু! আমি শুনিয়া আসিলাম ব্রজবাসী ব্রজবালার স্বামীর অনুসন্ধানে পূর্বদেশে গিয়াছেন। তোমরা যদি আগে জানাইতে তাহা হইলে আমি রমেশবাবুর মিলনটা করিয়া দিয়া আসিতাম। রমেশবাবু যেমন ভদ্রলোক, যদি তাঁর স্ত্রীকে তিনি না পান, তাহা হইলে ভগবানের রাজ্যে সৎকার্যের পুরস্কার থাকে না।"

নলিনাক্ষবাবু বলিলেন, "চলুন আমরা বৃন্দাবনে গিয়া রমেশ-বাবুর ঋণ শোধ করিয়া আসি গে।" উমেশও যাইবার জন্য আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল।

↦কমলার বহুদিনের আশা আজ ফলবতী হইল। যে কমল এতদিন মিলনদিবসের অপেক্ষায় মুদিত ছিল আজ সেই কমল প্রস্ফুটিত হইল। কমলা মনে করিল, সেই অজ্ঞাতবাসের পর স্থলপদ্মের দ্বারাই তাহার সহিত নলিনাক্ষের মিলন সার্থক হইয়াছিল। এ ঘটনাটা যে সত্য সে কথা কমলা বারংবার করিয়া হৃদয়ে অনুভব করিল। পরদিবস সে একটা পাত্রে প্রচুর স্থলপদ্ম আনাইয়া ব্রজবালার উদ্দেশে রাখিল। যে দুর্ভাগ্যের একই লিপি দুইজনের অদৃষ্টে লিখিত তাহাদের মিলনও ঐ একই জাতীয় পুষ্পের দ্বারা অভিষিক্ত হউক—ইহাই কমলার ইচ্ছা ছিল। ভগবান তাহাই সত্য করিলেন।↤

১৩

বসন্তের প্রভাতসমীরণ ঝিরঝির করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। সূর্য এখনও উদিত হয় নাই, তবে পূর্বগগন বেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। বিহঙ্গেরা স্ব স্ব আবাসবৃক্ষের শাখা-প্রশাখা কম্পিত করিয়া পূর্বদিক-অভিমুখে উড়িয়া যাইতেছে, আর মধ্যে মধ্যে 'কুহু কুহু' 'টুউ টুউ' 'বৌ কথা কও' ইত্যাদি নানাবিধ সুমধুর শব্দ করিতেছে।

রমেশ ও অন্নদাবাবু প্রাতর্ভ্রমণে বহির্গত হইয়া পদচারণ করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন রেলষ্টেশন হইতে একখানি অশ্বযান সবেগে আসিতেছে। গাড়ীখানি তাহাদের নিকটে আসিবার পূর্বেই কোচবাক্সে উপবিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়কে তাঁহারা চিনিতে পারিলেন।

গাড়ী তাঁহাদের নিকট আসিয়া থামিলে রমেশ তাড়াতাড়ি চক্রবর্তীখুড়ো এবং বলদেব ব্রজবাসীকে প্রণাম করিয়া কহিল, "গাড়ীর ভিতর কে আছেন?"

ব্রজবাসী কহিলেন, "আপনি ইঁহাদের চিনিবেন না, ইঁহারা আমার পরম সুহৃৎ। ইঁহারা কাশী হইতে আসিতেছেন, হাত্রাস ষ্টেশন হইতে আমরা একসাথে আসিতেছি।"

এই অবসরে নলিনাক্ষবাবু গাড়ীর ভিতর হইতে নামিয়া রমেশের সঙ্গে কোলাকুলি করিলেন।

ব্রজবাসী একটু আশ্চর্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "আপনাদের

কি পূর্ব হইতেই পরিচয় আছে? বোধ হয় একসঙ্গে পড়িয়াছিলেন?"

নলিনাক্ষবাবু বলিলেন, "একই রকমে পড়িয়াছি, তবে এক স্কুলে পড়ি নাই।"

চক্রবর্তীখুড়ো একটু হাসিয়া কহিলেন, "আমি ইঁহাদের দুই জনেরই এক রকমের মাষ্টারমহাশয়।"

ব্রজবাসী ইহার তাৎপর্য কিছুই বুঝিতে পারিলেন না।

গাড়ীর ভিতরে কমলাকে এবং পশ্চাতে উমেশকে দেখিয়া রমেশ মনে মনে ভাবিতে লাগিল, আজ আর ঠাকুরমার নিকট কোন বিষয় গোপন রাখিলে চলিবে না।

ক্রমে গাড়ী ব্রজবাসীর বাড়ীর নিকট পৌছিলে ব্রজবালা তাহার সইকে বাড়ীর ভিতর লইয়া গেল। কমলা হরসুন্দরীকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল।

হরসুন্দরীর আনন্দের সীমা নাই। তিনি কমলার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, "আজ আমার বাড়ী যেন আলো হইল। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে না থাকিলে কি শোভা পায়? আমি মাঘ মাসেই তোমাকে এখানে আনিবার জন্য রমেশকে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি মামার বাড়ী গিয়াছিলে বলিয়া রমেশ বিলম্ব করিল। আজ আমার মনে শান্তি হইল। তোমার ঘরকন্না তুমি দেখিয়া লও। আমি আজ আছি, কাল মরিয়া যাইব। তোমাকেই ঘরকন্না করিতে হইবে। তুমি কেমন করিয়া রমেশকে ছাড়িয়া ছিলে? আমি ত তোমার ঠাকুরদাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম না।" কমলা কোন কথার উত্তর না দিয়া মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

ঠাকুরমা কমলার সঙ্গে কি কথা বলেন শুনিবার জন্য রমেশ তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে একস্থানে দাঁড়াইয়াছিল। রমেশ ঠাকুরমাকে ডাকিয়া কানে কানে কি কথা বলিয়া বাড়ীর বাহিরে গেল।

হরসুন্দরীর মুখ শুখাইয়া গেল। চোখের জল গণ্ডস্থল ভাসাইয়া পড়িতে লাগিল। রমেশ বাল্যকাল হইতেই খুব আব্দার করিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ সে মাতৃহীন বলিয়া বৃদ্ধা কোন দিন তাহার কোন ইচ্ছায় বাধাদান করেন নাই। রমেশ রাগ করিয়া পলাইয়া যাইতে পারে, এই ভয়ে হরসুন্দরী কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। ⇛মনে করিলেন রমেশের এখন কর্তব্যজ্ঞান হইয়াছে, সে নিজের ভালোমন্দ বুঝিতে পারিবে।⇚

১৪

রমেশ চক্রবর্তীখুড়োকে কহিল, "খুড়োমহাশয় যে এবার সদলবলে আসিলেন, ব্যাপারটা কি ?"

খুড়োমহাশয়। আপনার হারানো জিনিস কুড়াইয়া আনিয়াছি, পুনরায় গ্রহণ করুন।

রমেশ। আমার এমন কি জিনিস হারাইয়াছে ?

খুড়ো। গ্রহণ করিবেন কিনা অঙ্গীকার করুন।

রমেশ। গ্রহণের উপযুক্ত জিনিস হইলে অবশ্য গ্রহণ করিব।

উমেশ এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। সে আর তাহার বাচাল মুখকে আট্‌কাইতে পারিল না। বলিয়া উঠিল, "ওগো, গেরণ আর করিবেন না কেন ? আপনি কি বলিতেছেন বলুন না।"

রমেশ হাসিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিল, "বাঁচিয়া থাক।"

উমেশ কহিল, "বাবু, বাঁচিয়া থাকা খুব ভাল আশীর্বাদ, মানুষ বাঁচিয়া থাকিলে কত কি দেখিতে—"

নলিনাক্ষবাবু "চুপ কর উমেশ" বলিয়া তাহার মুখের কথা শেষ হইতে দিলেন না।

নলিনাক্ষবাবু। আচ্ছা রমেশবাবু, আপনি যদি জিনিস গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র হন, তাহা হইলে ?

রমেশ। আমি জিনিসের পক্ষে উপযুক্ত হইলে জিনিসই আমাকে লইবে।

উমেশ উত্তর করিল, "বাবু, আমি দেখিয়াছি খাঁটি জিনিস হইলে জিনিসই জিনিসকে চিনিয়া লইয়া থাকে।"

বলদেব ব্রজবাসী ইঁহাদের নিকটেই আছেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন কথাতে তাঁহার মনোযোগ ছিল না। একটি মিথ্যামূলক সত্য প্রত্যক্ষ ঘটনায় তিনি নির্বাক হইয়া গালে হাত দিয়া কি ভাবিতেছেন।

হরসুন্দরী তাঁহার নিকটে আসিয়া কহিলেন, "ব্রজবাসী ঠাকুর, আপনি যে কার্যে গিয়াছিলেন তাহার কি হইল?"

ব্রজবাসী কহিলেন, "মা, ব্যাপারটা যে কি তাহা এখনও ঠিক আমি বুঝিতে পারিলাম না। ব্রজবালার পিতা ঈশানবাবুদের গ্রামে শুনিলাম ব্রজমোহনবাবুর পুত্র রমেশের সঙ্গে সুশীলার বিবাহ হইয়াছে। পরে সেখানে গিয়া জানিলাম, রমেশ তাহার স্ত্রী ও ঠাকুরমাকে লইয়া বৃন্দাবন-বাস করিতেছে। সেই নামের অন্য কোন গ্রাম আছে কি না তাহা অনেক চেষ্টাতেও অনুসন্ধান করিতে পারিলাম না।"

চক্রবর্তীখুড়ো বলিলেন, "আপনারা ব্যস্ত হইবেন না, সেই রমেশকে আমি এখনি আনিয়া দিতেছি, তিনি এই বৃন্দাবনেই আছেন। আগে আমার সন্দেশের ব্যবস্থা করুন।"

হরসুন্দরী কহিলেন, "আমাদের রমেশ বিবাহের পরে যে-বৌ লইয়া বাড়ী আসিয়াছিল, সে সুশীলা রমেশের বৌ নয়, তা এখনি জানিতে পারিলাম। আমার বোধহয় আপনার ব্রজবালা সুশীলাই রমেশের স্ত্রী।"

ব্রজবাসী কহিলেন, "আহা! তাহা হইলে পরম আনন্দলাভ করিব। আপনি একবার ব্রজবালাকে ডাকুন দেখি, এখনই সমস্ত সন্দেহের ভঞ্জন হইবে!"

হরসুন্দরী আনন্দের সঙ্গে "মা রাধারাণী, মনোবাসনা পূর্ণ কর!" বলিয়া ব্রজবালাকে ডাকিতে লাগিলেন।

১৫

সুখ কাহাকেও একবারে ফাঁকি দিয়া যাইতে পারে না। আজ হউক, কাল হউক, দুদিন পরে হউক, প্রত্যেক মানবের নিকট নির্ধারিত মাত্রায় তাহাকে আসিতেই হইবে।

সৌভাগ্যলক্ষ্মী যতই দূরে থাকুক না কেন, সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সময়ে একবার দেখা না দিয়া পারেন না। তবে তাঁহার স্থিতিকাল কম-বেশী হইতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া মানব এক জীবনে তাঁহার কৃপাদৃষ্টি লাভে বঞ্চিত হইবে না। পরমকারুণিক পরমেশ্বরের ইহাই করুণা।

সুশীলার সৌভাগ্যসূর্য সমস্ত বিপদকুহেলিকা ↦ভেদ করিয়া তাহার সৌভাগ্যগগনে↤ প্রদীপ্ত তেজে ↦শোভা পাইল।↤

কমলা ও হেমনলিনীর আনন্দধারা আজ তাহাদের হৃদয়ের কানায় কানায় ↦ভরিয়া↤ উঠিয়াছে। রোগী সুস্থ হইলে কখনো কখনো চিকিৎসকের স্থান অধিকার করে। আজ কমলা রমেশের নিকট সেই চিকিৎসক।

কমলা ও হেমনলিনী আজ সুশীলাকে পুনরায় নববধূবেশে সাজাইয়া আনিল। এখন তাহাকে দেখিলেই সাক্ষাৎ দেবীমূর্তি বলিয়া বোধ হয়। কমলা ধীরে ধীরে সকলের সম্মুখে আসিয়া রমেশকে প্রণাম করিয়া কহিল, "আমি এ জীবনে আপনার নিকট গুরুতর ঋণে আবদ্ধ আছি। আপনি ঘোর দুর্দিনে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আপনার মহত্ত্ব আমি কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব

না। আপনি যাহাকে লাভ করিতে গিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিলেন, এই আপনার সেই সুশীলাকে গ্রহণ করুন।" ↦রমেশ কোনো কথাই কহিতে পারিল না। অনির্বচনীয় আনন্দরসে তাহার হৃদয় আপ্লুত হইল। সে কেবল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া একবার সেই সকল রহস্যের উদ্ধারকর্তা, সেই পরমরহস্যময় ভগবানকে স্মরণ করিল। তাহার তপস্যা যে ব্যর্থ হয় নাই, আজ সে সম্মুখে তাহার প্রমাণ পাইয়া বাক্যবিহীন হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার নয়নের সম্মুখে ভাসিতেছিল হেমনলিনীর তপঃক্লিষ্ট মূর্তি। যেন স্বয়ং সিদ্ধিদাত্রী মূর্তিমতী হইয়া দণ্ডায়মান। সে সুশীলার হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে হেমনলিনীর নিকট অগ্রসর হইল। সুশীলা হেমনলিনীর পদধূলি গ্রহণ করিল। হেমনলিনী স্বাভাবিক সঙ্কোচের সহিত সরিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "সতীর তপস্যায় এবং পতির সাধনায় আজ এমন যে মিলন হইল তাহাতে আমার পদধূলির স্থান নাই। আপনারা বিধাতার চরণে চিরদিন অটল থাকুন ইহাই আজ আমার প্রার্থনা।" এই বলিয়া হেমনলিনী সুশীলার পাশে গিয়া কানে কানে কি ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কহিল।

সন্দেশের কথাটা এই সব গম্ভীর আয়োজনে চাপা পড়িয়া যাইতেছে দেখিয়া উমেশ চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বেশ কার্য-তৎপরও ছিল, সুতরাং ↤ চক্রবর্তীখুড়ো সন্দেশের নাম করিবামাত্র সে সন্দেশ আনিতে গমন করিল এবং অবিলম্বেই দুই টাকার সন্দেশ আনিয়া খুড়োমহাশয়ের হাতে দিয়া ↦খুব ভক্তির সহিত মাথাটা দুইবার মাটিতে ঠুকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।↤

কমলা কহিল, "উমেশ, তুমি এখন টাকা পাইলে কোথায়?"

উমেশ বলিল, "মা, আপনি আমাকে গাজীপুরে যে পাঁচ টাকা দিয়াছিলেন তাহার মধ্যে তিন টাকা খরচ করিয়া কাশী গিয়াছিলাম, আর অবশিষ্ট আজ খরচ করিয়া রমেশবাবুর ঋণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলাম।"

নলিনাক্ষবাবু হাসিয়া কহিলেন, "রমেশবাবু, আমাদের দুজনেরই পাকস্পর্শের ভোজ বাকী আছে, তাহা আজ এখানেই সম্পন্ন হউক।"

আনন্দে সকলের মুখ প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

বলদেব ব্রজবাসী — ব্রজবাসী কাশীতে গোস্বামীর নিকট —

রাধিকা — একবার পূর্ব্ববঙ্গ যাইবার মনস্থ করিলেন, কিন্তু যাত্রাকালে প্রথমেই তিনি প্রবল জ্বরে আক্রান্ত [illegible] হইয়া পড়িলেন। সুতরাং তাঁহার [illegible] বাবু [illegible] একজন [illegible]; তিনি [illegible] যত্নের সহিত চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। [illegible] রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। [illegible] বাবু এবং [illegible] ভাল ডাক্তারের [illegible]

ব্রজবাসী [illegible] তিনি কহিলেন "আমাকে মরিতেই হইবে, এ সময়ে যাহা আছে — আমার [illegible] ব্যয় করিলে আমার ব্রজবাসীর উপায় কি হইবে আমার জন্য [illegible] খরচ করিতে — হইবেনা"।

আগতির গতি পতিত পাবন, দাঁড়াও মন তাঁর শ্রীচরণ তলে।।
হাসিতে কাঁদিতে শয়নে ভোজনে [illegible] সকালে [illegible]
যদি ডাকো মন শ্রীমুখ [illegible] তরিতে পারিবে সে চরম কালে।।
আজ কিম্বা কাল শুনওরে মন, নিশ্চয় হইবে এদেহ পতন
কফে কণ্ঠ রোধ হবে যখন বিকার দেখে ডাকতে হরি বোলে।।

রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক সংশোধিত এবং বর্জিত দুটি অংশের প্রতিচিত্র